যেন্ত্রর নাম মূর্তি

এক্ষণ (৪০৪৬)

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে রণ-বিধ্বস্ত চীনে যে মেডিকাল মিশন পাঠানো হয়েছিল, তার কাহিনী নিয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক এবং সুসাহিত্যিক খাজা আহম্মদ আব্বাস তাঁর **'And One Did Not Come Back'** নামক বইখানি লেখেন। মূল গ্রন্থখানি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস মেডিকাল মিশন চীনবাসীদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন লাভ করেছিল। মিশনের সভ্যদের অসামান্য বীরত্ব ও মানব-প্রেম এবং সর্বোপরি ডাঃ কোট্‌নিসের চরম আত্মোৎসর্গ তাঁদের কাহিনীকে দিয়েছে অবিস্মরণীয় মর্যাদা। মূলগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে' আধুনিক চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক লিন্ ইউটাঙ্গ মন্তব্য করেছিলেন যে এ কাহিনীর বহুল প্রচার আবশ্যক। বর্তমান অনুবাদ বাঙ্গালী পাঠকসমাজে এ কাহিনীর প্রচারে সাহায্য করলে কৃতার্থ হব।

অনুবাদ মূলানুগ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি, সে বিচার পাঠক-পাঠিকারা করবেন। অনুবাদ ও মুদ্রণ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়েছে। অনবধানবশতঃ যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে, সেজন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

কংগ্রেস মেডিকাল মিশনের অন্যতম সদস্য ডাঃ বিজয়কুমার বসু বর্তমান অনুবাদের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে' এবং নানা বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন।

ডাঃ বসুর ডায়েরী থেকেই মূলগ্রন্থের উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল। তাঁর ভূমিকা নিঃসংশয়ে বর্তমান অনুবাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

কলিকাতা,

২৯শে পৌষ, ১৩৫৩।

শ্রীনেপালশঙ্কর সরকার



প্রকাশকের নিবেদন

প্রকাশনার দিক থেকে এই আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। জানিনে এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে কিনা! বাংলার বিদগ্ধ পাঠকসমাজ আশা করি তা বিচার ক'রে দেখবেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য বইটি প্রকাশ করতে বিশেষ দেরী হয়ে গেল ; এর জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও এর অঙ্গসৌষ্ঠব আশানুরূপ করতে পারলাম না ; পরে যদি কোনদিন সুযোগ পাই, তবে সে আশা পূরণ করতে চেষ্টা করব।

এই বই প্রকাশ ক'রতে যিনি বন্ধুপ্রীতিপরবশ হয়ে অকুণ্ঠিত প্রেরণা দিয়েছিলেন, সেই বন্ধুবর সুসাহিত্যিক অধ্যাপক সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 'মেয়েদের কথার' সম্পাদিকা কল্যাণী সেন, রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্সের শক্তিপদ কুমার ও আরও যাঁরা এই বই প্রকাশ করবার পথে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যাঁর সৌজন্যে বইয়ের ছবিগুলি পেয়েছি এবং যিনি পুরো পাণ্ডুলিপি পড়ে এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, চীনে ভারতীয় কংগ্রেস মেডিকাল মিশনের অন্যতম সদস্য সেই ডাঃ বিজয়কুমার বসুকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীশকুমার কুণ্ড

ভূমিকা

চীন থেকে ফেরার পথে সিয়ান থেকে পাওচি এরোড্রামে পৌছে দেবার ভার নিয়েছিলেন অষ্টম পন্থা বাহিনীর ছেন স্যু-জাং। পথ চলতে চলতে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তিনি বলে উঠলেন,—"বা—তাইক্ু! ভারতে ফিরেই কিন্তু তোমার একটা বই লেখা উচিত।" ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক বন্ধুর কাছেও এই অনুরোধ শুনেছি; এমন কি মিলিটারী সেন্সরের বাঙ্গালী কেরানীটি পর্য্যন্ত আমার ডায়েরীগুলি ফেরত দেবার সময় উৎসাহভরে মন্তব্য করলেন যে 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রভৃতির চেয়েও ভাল উপাদান এ গুলোতে রয়েছে। কিন্তু আজ তিন, সাড়ে-তিন বৎসর হল ফিরেছি, দুর্ভাগ্যবশতঃ বই লিখবার মত যথেষ্ট সুযোগ, ধৈর্য্য ও অবসর করে উঠতে পারিনি। সেজন্য বিশেষ কুণ্ঠিত। দেশের জনসাধারণের নাম করে আমরা সুদীর্ঘ পাঁচ বছর চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে কি ভাবে সাহায্য করেছি ও পেয়েছি,—আমাদের জাতীয় পতাকার যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা ক'রতে পেরেছি কিনা, তার জবাবদিহি সবার কাছে আমাদের ক'রতেই হবে এবং দেশবাসীর সেই স্বাভাবিক আগ্রহ যত শীঘ্র সম্ভব মেটাবার চেষ্টা করাই উচিত সর্ব্বপ্রথম। সেই চেষ্টা সার্থক হ'য়েছে বন্ধুবর খাজা আহম্মদ আব্বাসের অক্লান্ত লেখনীর সাহায্যে। তিনি ধন্যবাদার্হ। বস্তুতঃ ওঁর লেখা বইটা প্রধানতঃ বাস্তবানুগ বিবৃতি হয়েছে। ওঁরই কথায়,—"সাংবাদিক হিসেবেই" লিখেছেন, সাহিত্যিক হিসেবে নয়।" আমি বা আমার কোন সহকর্মী লিখতে গেলে হয়ে যেত প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ও আত্ম-কেন্দ্রিক। হয়ত দুই-ধরণের লেখারই প্রয়োজনীয়তা আছে। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এই দ্বিতীয় প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা আমি ক'রতে পারব, কিন্তু প্রথম প্রয়োজনটি জরুরী বলে

সুসাহিত্যিক আহম্মদ আব্বাসকে কিছুটা উপকরণ দিই, যা হতে তিনি "And One Did Not Come Back" নামক বইটি ১৯৪৪ সালের গোড়াতেই লিখে ফেলেন। এই ইংরেজী ভাষায় লেখা বইটার অসম্ভব রকমের চাহিদা দেখে মনে হয়, আমাদের বুদ্ধিজীবি ও ছাত্র মহলে চীন সম্বন্ধে জানবার শুনবার আগ্রহ খুব প্রবল, বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রেরিত চীনা মেডিকাল মিশনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে। সেই হিসেবে এই বইটির বাংলা অনুবাদ— "ফেরে নাই শুধু একজন" বাঙ্গালী পাঠকগোষ্ঠির কাছে যে খুব আদর পাবে তাতে কিছুই সন্দেহ নেই; তার প্রথম কারণ, অনুবাদটি হয়েছে হুবহু এবং এবং খুবই বিশ্বস্ত—অথচ অনুবাদ-সাহিত্য বলে আদৌ মনে হয় না। আর দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধকালীন ছাপানর দরুণ ইংরেজী বইটাতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল—বাংলা সংস্করণে তা সবই সংশোধন করা হয়েছে, এমন কি উন্নত ধরণের প্রকাশন ও অনেক ছবি সংযোগে বইটার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হ'য়েছে।

এই বইটাতে যে সব ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে, তা আমার ডায়েরী হতে উদ্ধৃত। দিনের পর দিন কাজের শেষে পর্ব্বতে, গুহায়, প্রান্তরে, নানা অবস্থায় লিখে যাওয়া ডায়েরীর পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে যে সব ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে, কেবল সে সবই আব্বাস সাহেবকে আমি বর্ণনা করে গিয়েছিলাম। আমার তখনকার পরিবর্ত্তনশীল মানসিক অবস্থার পরিচয় এবং বহুপ্রকার ছোট ছোট ঘটনা ও আলোচনা আমার বা কোটনিস্ ও অন্যান্য সহকর্ম্মীদের উপর যে ছায়াপাত করেছে এবং যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা পারিপার্শ্বিক তথ্যগুলির পর্য্যবেক্ষণ করেছি তার খুব সামান্য পরিচয়ই আমি লেখক আব্বাসকে জানাতে পেরেছি। এই নিদারুণ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উনি যে রকম চমৎকার ভাবে ক্রম-অনুযায়ী তথ্যের সমাবেশ ও সংযোজনা ক'রেছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা না করে পারা যায় না।

চীনের প্রতি ওঁর দরদ আমাদের চেয়ে অনেকাংশে বেশী বলেই এই লেখার ভিতর আমার অকথিত অনেক ভাষা খুঁজে পাই।

আমি ফিরে আসার পর ইয়াংসি নদী বেয়ে অনেক ঘোলা জল গড়িয়েছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীর ভারী পাথর বুক থেকে নেমেছে। মনে হয়েছিল বুঝি এত যুগের পরিশ্রম, ক্লেশ ও জীবনাহুতি কাজে এল; স্বাধীন, সুখী, নূতন চীন এশিয়ার পরপদানত জাতিগুলিকে পথ দেখিয়ে চলবে। কিন্তু তা হবার নয়। আমেরিকার হস্তক্ষেপ চীনের গৃহযুদ্ধকে জীইয়ে রাখছে; দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের পথে চলেছে। বস্তুতঃ কুওমিনতাং-এর নীতি চীনকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত ক'রছে।

তবে মস্ত বড় আশার আলো ক্রমবর্দ্ধমান অষ্টম পন্থা বাহিনী; চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে উত্তর ও মধ্য চীনের অগণিত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জয়যাত্রা। এই অভিযান রোধ ক'রতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের আর নেই; তারই ঢেউ আজ ছাপিয়ে আসছে—গভীর আলোড়ন জাগাচ্ছে ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, ব্রহ্মে ও ভারতের কোটি কোটি শোষিত জনসাধারণের বুকে।

ভারতের ডাক্তারগণই একমাত্র বিদেশী, যাঁদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূতগণ টেনে নিয়েছিল নিকটতম আত্মীয় করে। তাঁরাই একমাত্র ভারতীয়, যাঁদের ঘনিষ্ঠভাবে এদের কার্য্যকলাপ রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করবার সুযোগ হয়েছিল বহুদিন যাবৎ। ভারতীয় ডাক্তারদের সেই চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতারই একটি দিক বর্ণিত হয়েছে এই বইয়ে।

৮ই জানুয়ারী ১৯৪৭
কলিকাতা

শ্রীবিজয়কুমার বসু

মূল গ্রন্থের লেখকের নিকট লিন্ ইউটাঙ্গের পত্র

প্রিয় মিঃ আব্বাস,

আপনার "And One Did Not Come Back" এর পাণ্ডুলিপি পড়বার সুযোগ পেয়ে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। আপনার লিখন-ভঙ্গী সাবলীল। চীনের ঘটনাবলীর একটি নিখুঁত ছবি আপনার বিবৃতিতে ফুটে উঠেছে, এই আমার বিশ্বাস। ভারতীয় চিকিৎসকরা চীনের জন্য কি করেছিলেন, ভারতের জনগণকে সে কথা জানাতে এ বই বিশেষ সাহায্য করবে। এ কাহিনীর অধিকতর প্রচার আবশ্যক।

ভবদীয় বিশ্বস্ত

১৬ই মার্চ, ১৯৪৪

লিন্ ইউটাঙ্গ

সূচীপত্র



বোম্বাইয়ে তাজমহল হোটেলে একটি চায়ের আসরে (৩১শে আগস্ট, ১৯৩৮) এই ফটো নেওয়া হয়। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন—(বাঁ দিক থেকে) ডাঃ বসু, ডাঃ চোলকার, মিসেস কৃষ্ণা হাথীসিং, চীনের সহকারী কন্সাল মিঃ চ্যাঙ্, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ অটল, মিসেস চ্যাঙ্, মিঃ হাথীসিং ও ডাঃ কোট্‌নিস্। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর পেছনে দাঁড়িয়েছেন ডাঃ মুখার্জি।



এ কাহিনীর যাঁরা মুখ্য পাত্র

১। ডাঃ এম্. অটল —মিশনের নেতা।

২। ” এম্. চোলকার —মিশনের সহকারী নেতা।

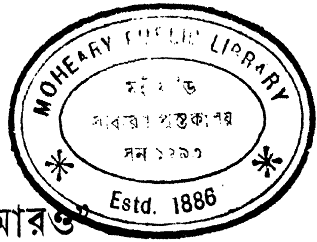
৩। ” ডি. এস. কোট্নিস—(১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর উত্তর চীনের কো কুঙ্ গ্রামে পরলোক গমন করেন)।

৪। ” ডি. মুখার্জি।

৫। ” বি. কে. বসু।

এই পাঁচজন ছাড়া এ কাহিনীর অন্যান্য নায়ক হ'লেন—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, যিনি চীনের প্রতি সৌহার্দ্যের চিহ্নস্বরূপ সেখানে একটি মেডিকাল মিশন পাঠাবার পরিকল্পনা করেন ; ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সহস্র সহস্র ভারতবাসী, যাঁরা কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অর্থ সাহায্যে মিশনের কাজ সম্ভব করেছিলেন ; মার্শাল চিয়াং কাই-শেক, মাদাম চিয়াং কাই-শেক, মাদাম সান ইয়াৎ-সেন, মাও ৎসে-তুঙ্, জেনারেল চুতে, জেনারেল চোউ এন্-লাই প্রমুখ চৈনিক নেতৃবৃন্দ, যাঁরা মিশনকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়েছিলেন এবং মিশনের চীনে অবস্থানকালীন এর সদস্যদের সর্বতোভাবে সাহায্য

করেছিলেন ; এবং সর্বোপরি চীনের জনগণ, যারা দীর্ঘ সাত বৎসর যাবৎ অসাধারণ বীরত্ব সহকারে নৃশংস জাপানী ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে সারা পৃথিবীর সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে—এদের সেবার জন্যই মিশনকে চীনে পাঠানো হয়েছিল। মিশনের সদস্যরা ফিরে এসেছেন—এবং একজন মৃত্যু-বরণ করেছেন—এই সুনিশ্চিত ধারণা নিয়ে যে, চীনের চরম সঙ্কটলগ্নে এই বীর দেশপ্রেমিকদের সেবা করবার যে সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন, তা তাঁদের জীবনকে ধন্য ক'রেছে, মহীয়ান ক'রেছে।



"এ কাহিনী আমারও"

I understand the large hearts of heroes,
The courage of present times and all times,
The disdain and calmness of martyrs......
All this I swallow, it tastes good, I like it well, it becomes mine,
I am the man, I suffered, I was there.

WALT WHITMAN

চীনে কংগ্রেস মেডিকাল মিশনের কাহিনী মিশনের সদস্যদের কেউ বললেই ভাল হ'ত। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই এমন একটি গভীর ও মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার কাহিনীকে যাথার্থ্য ও প্রামাণিকতার মর্যাদা দিতে পারে। কিন্তু ঘটনাচক্রে অন্ততঃ কিছুকালের মধ্যে তাঁদের কারও পক্ষে এ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হবে না। পাঁচজনের মধ্যে ডাঃ কোট্‌নিস্ আজ আর এ-জগতে নেই। ডাঃ অটল ও ডাঃ মুখার্জি এ বই লিখবার সময়* কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রয়েছেন—ফ্যাসি-বিরোধী আদর্শবাদের আশ্চর্য পুরস্কার! অবশ্য আশ্চর্য হলেও এর গভীর তাৎপর্য আছে। মিশনের প্রবীণতম সদস্য ডাঃ চোলকার তাঁর চিকিৎসা-ব্যবসায় নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। তা ছাড়া উত্তর-চীনের অস্বাস্থ্যকর

* মার্চ, ১৯৪৪

আবহাওয়া তাঁকে এক বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরে আসতে বাধ্য করেছিল।

বাকি রইলেন ডাঃ বসু। ইনি সবার শেষে চীন থেকে ফিরেছিলেন। ফিরেই চীনে আর একটি মেডিকাল মিশন পাঠাবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষময় জনমত গঠন করবার কাজে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। তবে তিনি দয়া ক'রে আমার সঙ্গে মিশন সম্বন্ধে দু'সপ্তাহের অধিককাল যাবৎ দীর্ঘ আলোচনা করেন। তাঁর বহুতথ্যপূর্ণ দিনলিপি থেকেই আমি প্রধানতঃ এ বইয়ের উপাদান সংগ্রহ করেছি। প্রয়োজনবোধে প্রকাশিত গ্রন্থাদি থেকে, বিশেষতঃ এড্‌গার স্নোর রচনা থেকে আমি অনেক স্থানীয় তথ্য গ্রহণ করেছি।

সাংবাদিক হিসেবেই আমি এ-বই লিখতে বসেছি—সাহিত্যিক হিসেবে নয়। এ-কাহিনীর ভাষা আমার, কিন্তু অভিজ্ঞতা সেই পাঁচজন নির্ভীক অভিযাত্রিকের, যাঁরা মিশনের সদস্যরূপে চীনে গিয়েছিলেন। তবে সাংবাদিকের দৃষ্টিতে আমি এঁদের অসম-সাহসিক অভিযানের যথার্থ রূপ উপলব্ধি করেছি। ডাঃ বসু যখন আমার কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছিলেন, তখন তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, আমি নিজেও যেন সেই অভিযাত্রীদলের একজন হয়ে চুংকিঙে বিমান-আক্রমণের প্রথম ধারণা লাভ করছি, কিংবা উত্তর পশ্চিম চীনে শত্রুব্যূহের মধ্য দিয়ে বিপদ্‌সঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করছি।

এই মহান্ কাহিনী বলবার অধিকার পেয়ে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন এই মিশনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ-সাহায্য চেয়ে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন করেন, তখন থেকেই আমি মিশনের উদ্দেশ্য ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে বিশেষ ভাবে জড়িত বলে মনে করে এসেছি। ১৯৩৮ সনের জুলাই মাসে আমি যখন সাংহাই-তে ছিলুম, সেই সময় সংবাদ পত্রে এই পরিকল্পিত মিশন সম্বন্ধে প্রথম খবর বেরোয়। ভারতীয় জনগণের এই সৌহার্দ্যের ইঙ্গিত চীনের গণচিত্তকে কেমন উৎসাহিত, বিচলিত ও কৃতজ্ঞ করেছিল, তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। যে চার বছর মিশন চীনে ছিল, সেই চার বছর ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রে এর সম্বন্ধে যেটুকু খবর পাওয়া যেত, তাই আমি গভীর আগ্রহসহকারে পড়েছি। পরিশেষে গত বছর (১৯৪৩) ডাঃ কোট্‌নিসের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি গভীর ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ি। সেই সময় আমি তাঁর শেষ মুহূর্ত্তগুলি অবলম্বন করে "বোম্বে ক্রণিক্‌ল্"-এর জন্য একটি কাল্পনিক কাহিনী লিখি। পরে আমার "লেট্ ইণ্ডিয়া ফাইট্ ফর্ ফ্রীডম্"-নামক গ্রন্থে "হি ডায়্‌ড্ ফর্ চায়না"- শিরোনামায় এই কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়। ডাঃ বসু এটি পড়ে আমাকে বলেছিলেন যে কাহিনীটি কাল্পনিক হ'লেও খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে ঘটনানুগ হয়েছে। এ কথা বললে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে চীনে দ্বিতীয় বার একটি

মেডিকাল মিশন প্রেরণের কাহিনী দিয়েই আমি সমসাময়িক ভারতবর্ষ সংক্রান্ত আমার উপন্যাস "টু-মরো ইজ্ আওয়ার্স"-এর সমাপ্তি সূচিত করেছি। এইসব কারণেই আশা করি যে চীনে কংগ্রেস মেডিকাল মিশনের কাহিনী বলবার যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি।

এ-কাহিনী যেমন চমকপ্রদ তেমনই প্রেরণাদায়ী। আজীবন সংবাদ নিয়েই যাদের কারবার, সেই সাংবাদিকদের জীবনেও এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা বিবৃত করবার সুযোগ হয়ত বিশেষ সৌভাগ্যক্রমেই একবার আসে। এ কাহিনী পাঁচজন অসমসাহসী আদর্শবাদীর কাহিনী। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ যিনি, তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর, আর সর্বকনিষ্ঠের বয়স ছাব্বিশও পোরেনি। তাঁরা বেরিয়েছিলেন করুণার ব্রত নিয়ে; পদে পদে নিজেদের স্বাস্থ্য ও জীবন বিপন্ন ক'রে তাঁদের অগ্রসর হতে হয়েছে; বহুবার তাঁরা অতি অল্পের জন্য জাপানী বোমার হাত থেকে বেঁচে গেছেন; পথহারা মরুভূমি ও জলার মধ্য দিয়ে তাঁদের হাজার হাজার মাইল হাঁটতে হয়েছে; শত্রুর হাতে বন্দী হবার আশঙ্কা ছিল তাঁদের প্রতিনিয়ত; নিকৃষ্ট এবং অপ্রচুর খাদ্যে তাঁদের জীবন ধারণ করতে হয়েছে; পাহাড়ের গুহায় এবং চাষীর কুটিরে বাঁশের তৈরী যন্ত্রপাতি দিয়ে তাঁদের অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। কিন্তু এই তাঁদের কাহিনীর সব নয়। দুঃখ-জর্জর, শৃঙ্খলিত ভারতের আত্মা পৃথিবীর

সর্বত্র নির্যাতিত মানবের কাছে যে-সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে গেছে, এ তারই কাহিনী। বিশ্বব্যাপী ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী ভারতের যে দান, এ তারই কাহিনী —এ গণতন্ত্রের প্রতি ভারতীয় জনগণের সহানুভূতির কাহিনী! স্বাধীন ভারত চীনের জন্য কি করতে পারত, এ কাহিনী তারই প্রতীক। আজ চীনের প্রতি বৃটেন ও আমেরিকার মৌখিক সহানুভূতির আর অন্ত নেই। কিন্তু আমেরিকা যখন জাপানে তেল ও সমরোপকরণ রপ্তানী করছিল, বৃটেন যখন চীনের প্রাণধারা-স্বরূপ বর্মা রোড বন্ধ ক'রে দিয়ে জাপানী সমর-নায়কদের তোষণ করছিল, তখন ভারতবর্ষ চীনে পাঠিয়েছিল এই মেডিকাল মিশন। এই মিশনের পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন, সেই জওহরলাল নেহরু আজ (মার্চ, ১৯৪৪) কারা প্রাচীরের অন্তরালে। তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে চীনের স্বয়ং-ঘোষিত বন্ধু, ভারতের বৃটিশ শাসকেরা। মহাত্মা গান্ধী এই মিশনকে তাঁর আশীর্বাণী দিয়েছিলেন এবং উৎসাহভরে এর সমর্থন করেছিলেন। তিনিও আজ (মার্চ, ১৯৪৪) কারারুদ্ধ। চীন রিলিফ কমিটির মিঃ জি, পি, হাথীসিং, যিনি মিশনের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য বিধিব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি সবেমাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। মিশনের জন্য যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাজার হাজার লোক আজ (মার্চ ১৯৪৪) কারাগারে। যে পাঁচজন চিকিৎসক

চীনের জন্য এবং ফ্যাসিবিরোধী আদর্শের জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন—ডাঃ অটল ও ডাঃ মুখার্জি—কারাগারে। এদিকে মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের সংবাদপত্র সমূহ জওহরলাল নেহরু, ডাঃ মুখার্জি, ডাঃ অটল প্রমুখ কারারুদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ প্রচার ক'রে চলেছে যে তাঁরা ফ্যাসিবাদের সমর্থক, তাঁরা গণতন্ত্রের শত্রু। সেই মিথ্যা অপবাদের জবাব দেবে এ বই!

কংগ্রেস মেডিকাল মিশন চীনের উচ্চতম সরকারী কর্মচারী থেকে আরম্ভ ক'রে জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলের কাছে যে বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছিল, তাতে এ-কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই ভারতীয় জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি। নয়াদিল্লীর স্বৈরশাসকেরা এবং সরকারী আমলারা আকাশপথে নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে যেয়ে ভাড়াটে দালালের হাতে-গড়া সভায় ভারতের নামে বক্তৃতা দিতে পারেন; কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—গান্ধী ও নেহরু—যে পাঁচজন চিকিৎসককে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরাই ভারতবাসীদের যথার্থ প্রতিনিধি ব'লে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁদেরই মধ্যস্থতায় ভারতীয় জনগণ চীনের প্রতি নিজেদের শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যের বাণী পাঠিয়েছিল; চীনের অনন্যসাধারণ প্রতিরোধশক্তির প্রতি জানিয়েছিল শ্রদ্ধা; আর বর্তমান মুক্তি-সংগ্রামে চীন-

ভারতের ঐক্যের মধ্য দিয়ে এই দু'টি প্রাচীন প্রতিবেশী জাতির যুগান্ত-সঞ্চিত মৈত্রীকে করেছিল পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত। মিশনের সদস্যরা ফিরে আসবার সময় চীনের পক্ষ থেকে সেই মৈত্রীর প্রতিদান বহন করে এনেছেন ভারতে ; এনেছেন চীনের কৃতজ্ঞতা ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম যেন অবিলম্বে জয়যুক্ত হয়, তার এই শুভেচ্ছা।...ফিরে আসেন নি শুধু একজন। শহীদ দ্বারকানাথ কোট্‌নিস্‌ মৃত্যুর পূত ও অবিচ্ছেদ্য রাখী-বন্ধনে চীন ও ভারতের স্বাধীন জনগণের মৈত্রীকে দৃঢ়তর করে দিয়ে গেছেন।

নিরস্ত্র সেনাবাহিনী

"কোন মানুষই স্বয়ং-সম্পূর্ণ দ্বীপের মত নয়; প্রত্যেকেই মহাদেশের একটি খণ্ড, মহাসাগরের একটি অংশ।............যে-কোন লোকের মৃত্যু আমার জীবনকে খর্ব করে, কারণ মানবজাতিরই একটি অংশ আমি; তাই যখন কারও মৃত্যুতে ঘণ্টাধ্বনি হয়, আমি জানতে চাই না কার মৃত্যু হ'ল। ঘণ্টাধ্বনি তো হচ্ছে তোমারই জন্য।"

—জন্ ডান্ (১৮শ শতকের ইংরেজ কবি)।

আধুনিক যুদ্ধের হীনতা ও বিভীষিকার খানিকটা লাঘব করে সেই "নিরস্ত্র যোদ্ধার দল," যারা রণক্ষেত্রের সব বিপদকে বরণ করে—হত্যার জন্য নয়, প্রাণদানের জন্য; আঘাত হানবার জন্য নয়, আহতের সেবার জন্য। বিবর্তনের ধারায় মানুষ যে ভ্রাতৃঘাতী শাখামৃগের চেয়ে উন্নততর জীবে পরিণত হয়েছে, তার একমাত্র প্রমাণ বোধহয় এই করুণা-বাহিনী— এই চিকিৎসক, নার্স ও স্ট্রেচার-বাহকেরা।

বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রমুখ মানব-প্রেমিকেরা যুগে যুগে সেবার যে-আদর্শ প্রচার করেছেন, সেই আদর্শেরই দীপশিখা জ্বালিয়েছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে। মানুষের বর্বরতার অন্ধতিমিরজালের মাঝখানে সেই দীপশিখা আজও তেমনি ভাস্বর। নার্স ক্যাভেলের দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে, কিন্তু তাঁর আত্মার গতি আজও অপ্রতিহত।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন ভারতীয় ব্যারিস্টার বোয়ার-যুদ্ধের বিভীষিকাময় রূপে বিচলিত হয়ে এই মানবতার সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ছিলেন সেই ঘৃণিত, কৃষ্ণকায় জাতিরই একজন, যার ওপর আফ্রিকার শ্বেতকায় শাসকরা অজস্র অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষণ করতেন। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের সাম্রাজ্যের সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীদের অহিংস প্রতিরোধকে সংহত ক'রে, তারই সাহায্যে তিনি তাদের রাষ্ট্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছিলেন। নিজেকে এবং নিজের স্বদেশবাসীদের যারা প্রতিনিয়ত অপমান করেছে, তাদের প্রতি ঘৃণা বোধ করবার যথেষ্ট কারণ তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই মহাত্মাদেরই একজন, যাঁরা যুগে যুগে বিদ্বেষ-বিসংবাদের বিষাক্ত আবহাওয়ার অনেক উর্দ্ধে মানবতার পতাকাকে উড্ডীন রেখেছেন। তাই তিনি গড়ে তুললেন এক "স্ট্রেচার-বাহক-বাহিনী।" এর কাজ হ'ল দ্ধরত সৈন্যদের মধ্য থেকে আহতদের বহন ক'রে াসপাতালে নিয়ে যাওয়া। এ কাজ যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি বিপদ্-সঙ্কুল। এ কাজে একাধিকবার তাঁর জীবন বিপন্ন 'য়েছে। কিন্তু এই "কালো" মানুষটি শুধু বিশ্বাস ও সাহসের অস্ত্র নিয়ে বারে বারে রণক্ষেত্রের অনলবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করেছেন তাদের বাঁচাবার জন্য, যারা তাঁকে অপমান করেছে, কোন ভারতীয়ের সঙ্গে রেল গাড়ীর এক কামরায় চড়ে

যেতেও যারা তীব্র ঘৃণা বোধ করত।

গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীদের বীরত্ব সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইয়ুরোপীয় লিখেছেন---

"গান্ধীর সম্বন্ধে আমি দেখেছি যে তিনি কখনও এমন কোন উপদেশ দেন না, যা কাজে পালন করতে তিনি নিজে অনিচ্ছুক। তাই এ ব্যাপারে মুখ্য অংশ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাবিক।............ কলেন্সোর যুদ্ধের আগের দিন এল রণাঙ্গণের পুরোভাগে কাজ করবার আহ্বান। এই এক সহস্র ভারতীয় স্বেচ্ছা-সেবক যথাসময়ে রণক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে যে সেবা করল, তা অমূল্য। অসাধারন উদ্দীপনার মধ্যে যাত্রা ক'রে তারা ঠিক প্রয়োজনের সময় শিয়েভ্‌লিতে পৌঁছাল। সেখানে পৌঁছিয়ে তারা ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যও অপেক্ষা করেনি। সরাসরি 'মার্চ' ক'রে তারা কলেন্সোতে গেল। সারারাত তারা অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবাব্রত চালাল।

"সেখানে তাদের খুব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হ'ল আহতের সংখ্যা ছিল খুবই বেশী। মুমূর্ষুদের নিদারুণ যন্ত্রণা তাদের স্মৃতিপটে আঁকা রইল। প্রান্তরে, নদীতীরে, সর্বত্র হতাহত সৈন্যদের দেহ স্তূপীকৃত হয়ে ছিল। ঐ যুদ্ধে মোটামুটি দেড়শজন নিহত হয় আর আহত হয় সাতশ কুড়ি জন। এখানে সাহায্যের

আহ্বানে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবীরা আগ্রহসহকারে সাড়া দেয় এবং ইয়ুরোপীয় সহকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে সমান নিষ্ঠাভরে কর্তব্য-পালন করে।

"এই যুদ্ধের ভীষণতম মুহূর্তে, যখন নদীর পরপারে হতাহতের সংখ্যা অনবরতই বেড়ে চলেছিল, সাহায্য-কারীর সংখ্যা যখন ছিল নগণ্য, সেই সময় প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকরা নদী পার হ'ল। পরপারে যেয়ে তারা সুরু করল আহতের সেবা। সেদিন ভারতীয়দের নিপুণ সেবাই আমাদের অনেক সৈন্যের প্রাণরক্ষা করেছিল।.........এই ভারতীয়রা অনেক সময়েই অবমাননা ও নির্য্যাতন সহ্য করেছে, কিন্তু বিশেষ প্রশংসার্হ ভাবে সেবাকার্য্য চালিয়ে তারা সেদিন সৈন্যদের অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিল।*" মানবিকতার এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই মহাত্মা গান্ধী ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধের সময় সমস্ত রাজনৈতিক বিতর্ক ও জাতিবিদ্বেষজাত তিক্ততাকে অগ্রাহ্য ক'রে একটি ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী 'য়্যাম্বুলেন্স'-বাহিনী গঠন করেন।

এর আগে, ১৯১২ সনে, তুরস্ক বল্কান যুদ্ধের সংঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, রক্তস্নাত এবং চারিদিক থেকে বিপর্যস্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করছিল। পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসকের অভাবে সহস্র সহস্র আহতের মৃত্যু

* "য়্যান্ ইণ্ডিয়ান্ প্যাট্রিয়ট্ ইন্ সাউথ আফ্রিকা"—জোসেফ সি ডোক্।

হচ্ছিল। সেই সময় বিলাত-ফেরত তরুণ ভারতীয় চিকিৎসক ডাঃ মুখ্‌তার্‌ আহম্মদ আন্‌সারি (ইনি পরে কংগ্রেসের সভাপতি হন) চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীদের একটি বাহিনী গঠন করেন এবং উপযুক্ত ওষুধপত্র নিয়ে তুরস্কে যান। ভারতীয় মুসলমানরা এই কল্যাণময় প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য অর্থ-সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ডাঃ আন্‌সারি ও তাঁর মেডিকাল মিশনের এই নিঃস্বার্থ সেবাকে তুর্কিরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দিয়ে অভিনন্দিত করেছিল।

আবিসিনিয়ার ওপর মুসোলিনী ও তার "কালো কোর্তা" অনুচরদের অকারণ আক্রমণ ভারতের জনমতকে এমন ক্ষুব্ধ করেছিল, যা খুব অল্প ঘটনাই করেছে। ভারতের রাষ্ট্রিক-চেতনার মুখপাত্ররূপে জাতীয় কংগ্রেস আক্রমণকারীদের নিন্দা ক'রে এবং আক্রান্ত আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অসহায় হাবসীদের সাহায্যের জন্য একটি মেডিকাল মিশন পাঠাবার উদ্দেশ্যে নানা রকম পরিকল্পনাও করা হ'তে থাকে। কিন্তু কোন পরিকল্পনা কাজে পরিণত হবার আগেই ফ্যাসিস্ত উচ্চাকাঙ্খার প্রথম শীকার ইথিওপীয়ার স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী লীগ অফ্‌ নেশন্‌সের ক্লৈব্য। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইতালীর বিরুদ্ধে যে-সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লীগ অনুমোদন করেছিল, তোষণপন্থী ফ্রান্স ও বৃটেন সেগুলিকেও কাজে পরিণত হ'তে দেয় নি।

স্পেনের গৃহযুদ্ধকে অনেকে যথার্থভাবেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা ব'লে মনে করেন। ভারতের বে-সরকারী পররাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো ও তার অন্তরালবর্তী নাৎসি-ফ্যাসিস্ত পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে অনমনীয় প্রতিকূলতার ভাব গ্রহণ করে। সেবার কংগ্রেস সর্বপ্রথম প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে নির্বাচনের জন্য দাঁড়িয়েছে। অজস্র নির্বাচনী বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু স্পেনের সমস্যাকে একটি অতি প্রয়োজনীয় সমস্যারূপে ভারতীয় জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। কিছুদিন পরে জওহরলালের আত্মীয় এবং প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী ডাঃ অটল স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি ভারতের শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যের বাণী বহন ক'রে স্পেনে যান এবং একাই সর্ব প্রযত্নে আন্তর্জাতিক বাহিণীর আহতদের সেবা করেন। পণ্ডিত নেহরু নিজেও একবার সেখানে যেয়ে গণতন্ত্রী স্পেনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ভারতের ঐক্যের বাণী প্রচার ক'রে আসেন।

ইতিমধ্যে চীনে আর একটি অধিকতর ভয়াবহ নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। জাপানী রণনীতির বিভীষিকাময় ছায়া ধীরে ধীরে চীনকে আচ্ছন্ন করছিল। নান্‌কিংয়ের সংঘর্ষ—যাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত বলা যেতে পারে—ক্রমে চীনের ওপর জাপানের সর্বাঙ্গীণ অভিযানে পরিণত হচ্ছিল। ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা নির্লিপ্ত ঔদাস্যভরে

দেখছিল কেমন ক'রে শক্তিশালী, যন্ত্রশিল্পে উন্নত, 'আধুনিক' এবং 'প্রগতিশীল' জাপান প্রাচীন, 'অনগ্রসর' এবং 'অসভ্য' চীনকে পর্যুদস্ত করছে। নিরস্ত্র, তুর্বল চীনকে গ্রাস ক'রে সাম্রাজ্যলিপ্সু জাপান 'বাঁচবার স্থান' এবং পণ্যবিক্রয়ের বাজার সংগ্রহ করছে—নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা এর মধ্যে অন্যায় বা আপত্তিজনক কিছুই দেখতে পায় নি। কিন্তু বিদেশী শাসনের তুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের আছে; তাই চীনের বেদনা তার অন্তরকে বিচলিত করল। স্পেন বা আবিসিনিয়ার প্রতি ভারতের সহানুভূতি ছিল অনেকটা আদর্শ-নৈতিক কিন্তু চীনের প্রতি তার সহানুভূতি হ'ল আরও ঘনিষ্ঠ, আরও গভীর। ভারতবাসীর কাছে চীন পৃথিবীর মানচিত্রে একটি চিহ্নমাত্র নয়; শুধু ভূগোল বইয়ের মারফৎ চীনের সঙ্গে ভারতের পরিচয় গড়ে ওঠে নি। চীন আমাদের প্রতিবেশী; হাজার হাজার বছর ধ'রে তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক চলে আসছে। বুদ্ধ ও অশোকের সময় থেকে চীনের সঙ্গে আমরা বাণিজ্য করেছি, ধর্ম ও দর্শনের আদান প্রদান করেছি। এই চীনের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে—এই সেই সান্ ইয়াৎ-সেনের চীন, চিয়াং কাই-শেকের চীন, মাও ৎসে-তুঙ্ এবং চু তে'র চীন। চীনের জনগণের এই জীবন-মরণ সংগ্রামে ভারতবর্ষ তাই নিষ্ক্রিয়

দর্শকমাত্র হয়ে থাকতে পারে নি।

কিন্তু ভারতের মত শৃঙ্খলিত দেশ কি-ই বা করতে পারে? ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হ'ত, তা হ'লে জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রেও সে সমরোপকরণ পাঠিয়ে চীনকে সাহায্য করতে পারত, যেমন ভাবে সোভিয়েট রাশিয়া স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারকে সাহায্য করেছিল। তখন ভারতবর্ষের এমনি অবস্থা যে জাপ-বিরোধিতার কোন নিদর্শন দেখলেই কর্ত্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হতেন, কারণ চেম্বারলেনের তোষণনীতির প্রভাব তখন তাঁদের চালিত করছিল। জওহরলাল নেহরুর প্রতিভা এমন একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করল, যাতে ভারতবর্ষ তার চিরন্তন মানব-প্রেমের একটি নিদর্শন দেখাতে পারে এবং চীনের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অন্ততঃ খানিকটাও লাঘব করতে পারে। কংগ্রেস ডাঃ অটলের নেতৃত্বে চীনে একটি মেডিকাল মিশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সাহায্যের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করা হ'ল; প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটি নির্ব্বাচিত হ'ল; অর্থ এবং চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম সংগৃহীত হ'তে লাগল। মানব-প্রেমিকদের দান, বিভিন্ন রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত ওষুধ ও যন্ত্রপাতি, জনসাধারণের চাঁদা, এমন কি অভিনয় ও বিচিত্রানুষ্ঠানের লভ্যাংশ পর্য্যন্ত নিয়ে সাহায্য-ভাণ্ডার গড়ে উঠল। মিশনের সদস্য হবার জন্য অনেক চিকিৎসক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে

আবেদন করলেন। ডাঃ জীবরাজ মেহ্‌টা, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের এক কমিটির ওপর পড়ল মিশনের সদস্য নির্বাচনের ভার। স্বাস্থ্য, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কথা বিচার ক'রে তাঁরা চারজনকে মনোনীত করলেন ; তা ছাড়া ডাঃ অটল তো ছিলেনই।

এঁদের মধ্যে ডাঃ চোলকারের বয়স সবচেয়ে বেশী। যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনে এই বিপজ্জনক অভিযানের জন্য যখন তিনি প্রার্থী হন, তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তাঁর অভিজ্ঞতা বহু দিনের ; নাগপুরে তিনি সবচেয়ে খ্যাতনামা চিকিৎসক। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁর সক্রিয় সহানুভূতির কথা সুবিদিত। গান্ধীজীর তিনি একজন একনিষ্ঠ অনুগামী। মানবিকতা এবং জাতিপ্রেমই তাঁকে এই মিশনের কাজে স্বেচ্ছাসেবক হ'তে প্রণোদিত করেছিল। বাকি তিনজনেরই বয়স তিরিশের নীচে। কলকাতার ডাঃ মুখার্জি এবং শোলাপুরের ডাঃ দ্বারকানাথ কোট্‌নিস্ (ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী পাশ করেন) দু'জনেই অবিবাহিত ; মিশনের কাজে এঁরা যেমন একটি মহান্ সেবার আদর্শ দেখেছিলেন, তেমনি দেখতে পেয়েছিলেন, একটি বিপদ্-সঙ্কুল অভিযানের রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা। ডাঃ বিজয় কুমার বসু বামপন্থী রাজনীতিতে উৎসাহী কর্মী এবং চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল। ডাঃ বসু বিশেষ সৌভাগ্য-ক্রমেই নির্বাচিত হ'তে পেরেছিলেন ; কারণ তাঁর আবেদন

করবার আগেই কলকাতার ডাঃ রণেন সেন মিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে কম্যুনিস্ট ব'লে সন্দেহ করে, তা ছাড়া এর আগে কয়েকবার তিনি রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিতও হয়েছিলেন—সেই জন্যই তাঁর পক্ষে চীনযাত্রার ছাড়পত্র পাওয়া সম্ভব হ'ল না। তাই শেষ মুহূর্তে ডাঃ বসু তাঁর পরিবর্তে মনোনীত হ'লেন।

১৯৩৮ সনের আগষ্ট মাসের শেষদিকে তাঁরা পাঁচজন বোম্বাইয়ে এলেন। পরস্পরের সঙ্গে এই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। ডাঃ অটল শেষমুহূর্তের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত; প্রবীণ ও বিজ্ঞ ডাঃ চোলকারের উৎসাহের মধ্যে একটা গাম্ভীর্যের ভাব; আর তিনজন তরুণ সদস্য উৎসাহ উদ্দীপনায় পূর্ণ—বিপদের রোমাঞ্চকর আশঙ্কায় তাঁদের তরুণচিত্তে এসেছে এক অসমসাহসিক আনন্দের জোয়ার! বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় বোম্বাইয়ের জনসাধারণ এই পাঁচজন চিকিৎসককে আন্তরিক বিদায় অভিনন্দন জানাল। সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁদের সম্বোধন ক'রে বললেন, "আপনারা এক বিপদ-সঙ্কুল কাজের ভার নিয়েছেন। চীনা সহকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে, চীনের স্বাধীনতার জন্য আপনাদের হয়ত প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হ'তে পারে।" চার বছর পরে যখন চীন থেকে দ্বারকানাথ কোট্‌নিসের মৃত্যু-সংবাদ আসে, তখন শ্রীমতী নাইডুর এই ভবিষ্যৎ-বাণীর মত

কথাগুলি আমাদের মনে জেগে উঠেছিল। কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর যখন বোম্বাইয়ের ব্যালার্ড পীয়ার থেকে পি. এণ্ড ও. কোম্পানীর “রাজপুতানা” জাহাজে ক’রে মিশনের সদস্যদের যাত্রা সুরু হয়, তখন কোন উদ্বেগ বা আশঙ্কা তাঁদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত ক’রে রাখে নি।

বোম্বাইয়ের চীনা অধিবাসীরাও মিশনকে বিদায় অভিনন্দন জানাল। এই অনুষ্ঠানে মিশনের সদস্যদের মাল্যভূষিত করা হ’ল। চীনা ছেলেরা চীনের জাতীয় সঙ্গীত গাইল। চীনের সরকার ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে চীনের সহকারী কন্সাল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু সেখানে উপস্থিত থেকে মিশনকে আবার তাঁর যাত্রাকালীন শুভেচ্ছা জানান। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন মিঃ ও মিসেস্ হাথীসিং এবং “বোম্বে ক্রনিক্‌ল্”-এর সম্পাদক মিঃ এস. এ. ব্রেলভী।

মিশনকে বিদায় দিতে জাহাজঘাটে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ কোট্‌নিসের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাই ছিল বেশী। এঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর মেডিকাল কলেজের সহপাঠী। তাঁর বয়স্ক পিতা মাতাও এসেছিলেন। জাহাজে উঠবার সময় কোট্‌নিস্ যখন তাঁদের প্রণাম করলেন, তাঁরা বীরসন্তানকে জানালেন আশীর্বাদ।

মধ্যরাত্রে এই পাঁচজন ‘নিরস্ত্র যোদ্ধা’কে নিয়ে জাহাজ ছাড়ল। তাঁদের সঙ্গে ছিল—

একটি য়্যাম্বুলেন্স্ ট্রাক্,
একটি য়্যাম্বুলেন্স্ কার,
ষাট বাক্স ওষুধ ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি,
একটি বহনযোগ্য এক্সরে'র যন্ত্র, এবং

সমগ্র জাতির শুভেচ্ছা, যে জাতির পক্ষ থেকে তাঁরা চীনে নিয়ে চলেছিলেন, শুধু চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জামই নয়, সেই সঙ্গে আশা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতার বাণীও।

অভিযানের ভূমিকা

"আমি চীনে চলেছি—কিন্তু আমার হৃদয় থাকবে ভারতবর্ষে। চীন ও ভারত আমার মনে এক হয়ে মিশে যাবে। চীনের জনসাধারণের সাহস ও অদম্য আশাবাদ, বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের একতাবদ্ধ হবার ক্ষমতা—এরই কিছুটা আমি চীন থেকে নিয়ে আসব, এই আমার আশা।"

—জওহরলাল নেহরু

(১৯৩৯ সনে চীনযাত্রার প্রাক্কালে বক্তৃতা)।

"রাজপুতানা" জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামকক্ষ মুখর হয়ে উঠেছে যাত্রীদের উৎসুক গুঞ্জন-ধ্বনিতে :

"শুনেছ ... ... ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঁচজন ভারতীয় ডাক্তার ..."

"তাঁরা নাকি চীনে চলেছেন !"

"না, না, ভারতসরকারের তরফ থেকে তাঁরা যাচ্ছেন না। তাঁদের পাঠাচ্ছে গান্ধীর কংগ্রেস।"

"তাঁদের দেখেছেন আপনি ?"

"এই যে তাঁরা আসছেন।"

ত্ব'একজন পদমর্যাদাস্ফীত "বড় সাহেব" ছাড়া যাত্রীরা সবাই মিশনের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। শাদা গান্ধীটুপিতে তাঁদের পাঁচজনকে সহজেই চিনতে পারা যাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই যাত্রীরা তাঁদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। চীনের সম্বন্ধে যাদের

অভিজ্ঞতা না-কি খুব বেশী, সেই সব হুইস্কিপায়ী ইয়ুরোপীয় বণিক-প্রতিনিধিরা সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়ে মিশনদের সদস্যদের তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল। মহিলা যাত্রীরা জাহাজের সামাজিক জীবনে—নাচ, তাসখেলা ইত্যাদিতে—তাঁদের আকৃষ্ট করবার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু যে দু'জন চীনা যাত্রী জাহাজে ছিলেন, মিশনের ডাক্তাররা স্বভাবতঃই তাঁদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ'লেন। তাঁরাও এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হ'লেন। এই দু'জনের মধ্যে যিনি বয়সে বড়, তিনি ছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর চাও টিঙ্ চী, পি-এইচ. ডি। ইনি একজন খ্যাতনামা অর্থনীতি-ও সমাজতত্ত্ব-বিদ্, "য়্যামেরেশিয়া" পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ইন্‌স্টিট্যুট্ অফ্ প্যাসিফিক রিলেশন্‌সের' একজন সভ্য। অপর চীনা যাত্রীটির নাম মিঃ ওআঙ্। ইনি ইংলণ্ড থেকে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে ফিরছিলেন। দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগে এঁর মন ছিল পূর্ণ। নির্যাতিত মাতৃভূমির সেবায় নিজের নবার্জিত বিদ্যাকে প্রয়োগ করবার আগ্রহে ইনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন। মিশনের সদস্যরা আধুনিক চীন সম্বন্ধে এড্‌গার স্নো, য়্যাগ্নেস্ স্মেড্‌লী প্রভৃতি লেখকদের বই পড়তে সুরু করেছিলেন। তাই এই দু'জন শিক্ষিত এবং দেশপ্রেমিক চীনবাসীর কাছ থেকে চীন-সম্বন্ধে নিজেদের জ্ঞানকে প্রসারিত করবার সুযোগ পেয়ে তাঁরা

খুব আনন্দিত হ'লেন। বিশেষ ক'রে ডাঃ চী'র কাছ থেকে তাঁরা চীনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানলাভ করলেন।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে ইতালীয় জাহাজ "কন্তে ভার্দে"তে ক'রে মিশনের সভ্যরা চীনে যাবেন। কিন্তু সে সময়ও ফ্যাসিস্তরা তাদের জাপানী স্বগোত্রদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করত। চীনের জন্য চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম বহন করতে ইতালীয় জাহাজ কোম্পানী রাজী হ'ল না। তাই শেষ মুহূর্তে আগের বন্দোবস্ত নাকচ ক'রে বৃটিশ পি. এণ্ড ও. কোম্পানীর "রাজপুতানা" জাহাজে মিশনকে পাঠানো হ'ল। চার বছর পরে জার্মাণ সাবমেরিণের আক্রমণে এই "রাজপুতানা" জাহাজ জলমগ্ন হয়।

মিশনের তিনজন তরুণ সদস্য কোট্নিস্, বসু ও মুখার্জির এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা। এই নূতন অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই তাঁদের মনে চাঞ্চল্য জাগাল। পড়াশুনো বা চীনা বন্ধুদের সঙ্গে আলাপের অবসরে তাঁরা ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দেখতেন উড়ন্ত মাছের গতিবিলাস কিংবা অস্তরবির আভায় উদ্ভাসিত মেঘের বিচিত্র বর্ণালী। জাহাজ তখন আরব সাগরের ওপর দিয়ে অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

কলম্বো থেকে ক্যান্টন পর্যন্ত প্রত্যেক বন্দরে স্থানীয় জনসাধারণ মিশনকে সম্বর্দ্ধনা জানাল। কলম্বোতে জাহাজ পৌঁছাল অতি প্রত্যূষে—কিন্তু খবরের কাগজের সংবাদদাতারা,

স্থানীয় চীনা ও ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিরা এবং কলম্বো বণিক-সভা ও রেড্‌ক্রশের প্রতিনিধিরা আগে থেকেই মিশনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জাহাজঘাটায় উপস্থিত ছিলেন। গ্র্যাণ্ড হোটেলে তাঁদের আতিথেয় সংকারে আপ্যায়িত করা হ'ল, তারপর মোটরে ক'রে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হ'ল বেতার কেন্দ্রে। সেখানে ডাঃ অটল মিশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে একটি বেতার-বক্তৃতা দিলেন। অপরাহ্ণেও একটি জন সভায় ডাঃ অটল অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দিলেন।

চারদিন পরে তাঁরা পেনাঙ্‌ বন্দরে পৌঁছালেন। সেখানে একটি বিরাট চীনা ও ভারতীয় জনতা তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল। জাহাজ যখন বন্দরে ভিড়ল, চীনা ছাত্রীরা তাদের উদ্দীপনাময় জাতীয় সঙ্গীত "চিলাই" (জাগো!) গাইছিল। মিশনের সভ্যরা এরপর চীনের সর্বত্র এই গানটি শুনেছেন। শোভাযাত্রা ক'রে তাঁদের চাইনিজ্‌ এসোসিয়েশন হলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে যথারীতি সম্বর্দ্ধনাসূচক বক্তৃতা ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের পর তাঁদের ভারতীয় ও চীনা জাতীয় পতাকা উপহার দেওয়া হ'ল। এরপর তাঁরা অনেক শোভাযাত্রার পুরোভাগ অধিকার করেছেন, কিন্তু পেনাঙে এই প্রথম শোভাযাত্রার অভিজ্ঞতায় তাঁরা একটু অপ্রতিভ হয়েছিলেন, কারণ বীর বা দেশনেতা ব'লে সম্মানিত হবেন, এমন প্রত্যাশা তাঁরা করেন নি।

সিঙ্গাপুরেও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হ'ল। সিঙ্গাপুরের সুরম্য পোতাশ্রয়ে যখন তাঁদের জাহাজ ভিড়ল, তীর থেকে ভেসে এল "বন্দেমাতরম্" এবং "চিলাই"-এর মিলিত ধ্বনি। চীনগণতন্ত্রের পতাকার পাশে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়ছে, এ দৃশ্য দেখে তাঁদের অন্তর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এ যেন চীন-ভারতের ঐক্যের সুসমঞ্জস রূপক! জাহাজ থেকে নামতেই চীনা মেয়েরা তাঁদের গলায় মালা পরিয়ে দিল। তারপর মোটর গাড়ীর এক শোভাযাত্রা করে তাঁদের চীনা বণিক সভায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে চীনা অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁরা অভ্যর্থিত হ'লেন। পরে স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানালেন। সিঙ্গাপুরে তাঁরা যে বিপুল অভ্যর্থনা পেলেন, তা তাঁরা ভুলতে পারবেন না, কারণ সেখানে তাঁদের এত মালা পরানো হয়েছিল, আর এত ফুল ছড়ানো হয়েছিল তাঁদের গায়ে, যে তাঁদের কাপড়-চোপড় তাতে নষ্ট হয়ে যায়। জাহাজে ফিরে, পোষাক বদলিয়ে, তবে তাঁরা একটি নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে পারেন। ঠিক মধ্য রাত্রিতে তাঁদের জাহাজ ছাড়ল; সকৃতজ্ঞ স্মৃতির আবেগে অভিভূত হৃদয়ে তাঁরা সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নিলেন।

হংকং-এ পৌঁছাবার আগেই তাঁরা জাপানীদের কাছ থেকে এক অপ্রত্যাশিত "অভ্যর্থনা" পেলেন—যুদ্ধজাহাজ,

ক্রুজার, সাবমেরিন ও বিমানবাহী জাহাজের এক বিরাট বহর "রাজপুতানা"র পাশ দিয়ে চলে গেল। বৃটেন তখনও জাপানের মিত্রভাবাপন্ন নিরপেক্ষ জাতি। জাপানী নাবিকরা যখন তাদের ডেক থেকে পি. এণ্ড ও. কোম্পানীর এই জাহাজখানাকে দেখছিল, তখন তারা ভাবতেও পারে নি যে এই জাহাজে ক'রেই পাঁচজন ভারতীয় চিকিৎসক চলেছেন জাপানের সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনী ও বিমানবহরের দ্বারা আহত চীনের শুশ্রূষা করতে।

১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁরা হংকংএ পৌঁছালেন। "রাজপুতানা" জাহাজ থেকে যখন তাঁরা নেমে গেলেন, তখন যে বিগত পক্ষকালের সুখস্মৃতি তাঁদের মনকে বিচলিত করেনি, এমন নয়—কিন্তু সামনে যে রোমাঞ্চকর অভিযান রয়েছে, তারই চিন্তাতে তখন তাঁদের মন অধিকতর আকৃষ্ট। যাত্রাপথে তাঁরা যে কেবল বই পড়ে এবং চীনা বন্ধুদের কাছে শুনে রণবিধ্বস্ত চীন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তাই নয়—পরস্পরকে বেশ ভাল ক'রে জানবার সুযোগও তাঁদের হয়েছিল। এই দু'সপ্তাহে তাঁরা নিজেদের অনেক চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও উগ্রতাকে দমন করেছিলেন এবং পরস্পরের মেজাজ ও রুচির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা এক এক জন এক এক প্রকৃতির মানুষ—ডাঃ অটল প্রবীণ এবং বহুভ্রমণের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন একজন বিশ্বপ্রেমিক, তাঁর রাজনৈতিক মতামত স্পষ্টভাবে বামপন্থী; ডাঃ চোলকার

নাগপুরের খ্যাতনামা প্রবীণ চিকিৎসক, তিনি গান্ধীপন্থায় নিষ্ঠাবান্, নিরামিশাষী এবং দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেসকর্মী; ডাঃ মুখার্জি অবিবাহিত বাঙ্গালী তরুণ, দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণায় তিনি অনুপ্রেরিত; উৎসাহী এবং চট্‌পটে মারাঠী যুবক ডাঃ কোট্‌নিস্ এরই মধ্যে চীনাভাষা খানিকটা আয়ত্ত করেছিলেন; ঢাকার তরুণ ডাঃ বসু ছিলেন রাজনীতিতে বিশেষ আগ্রহশীল।

ডাঃ অটল মিশনের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। লোককে মুগ্ধ করবার অপরিসীম ক্ষমতা এবং সহানুভূতিশীলতার দ্বারা তিনি তাঁর সহকর্মীদের চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আজীবন চিকিৎসাশাস্ত্র এবং প্রগতিপন্থী রাজনীতির চর্চা ক'রে তিনি এক অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার সংগ্রহ করেছিলেন, তাছাড়া কথা বলবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় চিকিৎসক রূপে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রেছিলেন, তার কাহিনী তাঁর সহকর্মীরা আগ্রহভরে শুনতেন। তার মধ্যে তাঁরা চীনে নিজেদের ভবিষ্যৎ অভিযানের পূর্বাভাষ পেতেন।

হংকং-এর কৌলুন জেটিতে চীন সরকারের প্রতিনিধিরা এবং স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীরা মিশনকে অভ্যর্থনা ক'রে নিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সম্পাদক, প্রকাশক এবং রাজনৈতিক কর্মী শ্রীযুক্ত অমৃত লাল শেঠ। শ্রীযুক্ত শেঠ এবং অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁরা একটি

মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিলেন। চীনা বণিক সভার তরফ থেকে একটি চায়ের আসরে তাঁদের সম্বর্দ্ধিত করা হ'ল। সেখানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন চীনের অর্থসচিব মিঃ টি. ভি. সূঙ্, চীনা রেড্ ক্রশের সর্বাধ্যক্ষ ডাঃ উ এবং রণাঙ্গণ থেকে সদ্য-প্রত্যাবৃত্ত দু'জন নিউজীল্যাণ্ডের ডাক্তার।

এত ভোজ এবং আপ্যায়নের কথা কিন্তু মিশনের সভ্যরা এর আগে কল্পনাও করেন নি। তাঁদের চীনে আসবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আহত চীনা দেশপ্রেমিকদের সেবা করা। দেশের অভ্যন্তরের শোচনীয় অবস্থার কথা জানতেন ব'লেই এত সব সাড়ম্বর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে তাঁরা খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তবে যে আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে চীনা এবং ভারতীয় সবাই তাঁদের আরব্ধ সেবাব্রতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছিল তা গভীরভাবে তাঁদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। বস্তুতঃ অটল, চোলকার, মুখার্জি, বসু বা কোট্‌নিস্‌কে ব্যক্তিগতভাবে কেউ সম্মান দেখাচ্ছিল না— তাঁরা যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ভারতের সেই জাতীয় কংগ্রেসকেই সবাই সম্মান দেখাচ্ছিল তাঁদের উপলক্ষ্য ক'রে। তাঁরা সেখানে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও জওহরলালের প্রতিনিধি; তাঁরা সেখানে ভারতীয় জনগণের সৌহার্দ্য ও শুভেচ্ছার দূত! তাঁদের সম্মানে যে স্বাস্থ্যপান করা হয়েছিল, তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যে-সব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে

চীন-ভারতের ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বেরই স্বীকৃতি ছিল। এই সব স্বাগত-সম্ভাষণ ও প্রশস্তির উত্তরে ডাঃ অটল কখনও মিশনের এই বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিতে ভোলেন নি; এ-কথাও তিনি বলতে ভোলেন নি যে এই দুই মহাজাতির সুপ্রাচীন ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে তাদের উভয়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বারা; একের সংগ্রাম জাপানী যুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে, আর অপরের সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

ঐতিহ্যের দিক দিয়ে এবং ভৌগোলিক হিসেবেও হংকং চীনেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসেও বৃটিশের অধিকারভুক্ত থেকে এই বন্দর সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ-প্রসারের চিরপুরাতন কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। চীনগণতন্ত্রের অভ্যুত্থান এই সাম্রাজ্যবাদকে সংযত করলেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। এই আন্তর্জাতিক বসতিযুক্ত এবং উন্নাসিক বাণিজ্যিকভাবে পূর্ণ হংকং বন্দরের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াতেও ভারতীয় চিকিৎসকরা রণদেবতার আতপ্ত শ্বাস অনুভব না ক'রে পারেন নি। হংকং—ক্যান্টন্ রেলপথের ওপর জাপানীরা বারবার বোমা বর্ষণ করছিল। দেশের অভ্যন্তর থেকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়-প্রার্থী এখানে উপস্থিত হয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে য়্যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই চীনাদের মধ্যে একটা সুপরিলক্ষিতব্য তীব্রতা ও অকথিত ঘৃণার ভাব ছিল সেই সব জাপানীদের বিরুদ্ধে, যারা তখনও সেখানে বাস করছিল। য়ুনিয়ন

জ্যাকের আশ্রয়ে এই সম্ভবপর বিভীষণ-বাহিনী ডাক্তার ও দন্ত-চিকিৎসকের মুখোস পরে সেখানে বাস করছিল। ভোর বেলা ভারতীয় চিকিৎসকরা তাঁদের হোটেলের জানালা দিয়ে দেখতে পেতেন চীনা বে-সামরিক অধিবাসীরা, এমন কি শিশুরা পর্যন্ত, কুচ-কাওয়াজ করছে এবং সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিশুরা পর্যন্ত রাইফেল নিয়ে কুচ-কাওয়াজ করছে কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে একজন বৃদ্ধ চীনা ভদ্রলোক তীব্র আবেগের সঙ্গে বললেন, "আমরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"

সতেরোই সেপ্টেম্বর মিশন "ফ্যাটশুন্" জাহাজে ক'রে ক্যাণ্টন অভিমুখে যাত্রা করলেন। জাহাজ ধীরগতিতে "পার্ল"-নদীর ব-দ্বীপ অতিক্রম করতে লাগল। জাহাজের ডেক থেকে মিশনের সভ্যরা এই প্রথম চীনদেশের অভ্যন্তরভাগের দৃশ্য দেখতে পেলেন। এবার তাঁরা চীনগণতন্ত্রের অধিকার-ভুক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, ধীর-বঙ্কিম-রেখায় চিহ্নিত পাহাড়ের কোলে বিস্তৃত রয়েছে চীনের উর্বর উপত্যকা। এই সেই শ্রীময়ী ধরিত্রী (Good Earth)! —হাজার হাজার বছর ধরে সরল, শান্তিপ্রিয় চীনারা নিজেদের শ্রমের স্বেদে ও শোণিতে একে উর্বর করে তুলেছে; এই মৃত্তিকায় তারা শস্য উৎপাদন করেছে; সন্তানসন্ততিকে লালিত করেছে; করুণায় স্নিগ্ধ, সুপরিণত একটি জীবন-দর্শন এবং একটি স্থায়ী সভ্যতা গড়ে তুলেছে। কিন্তু আজ

এ দেশের ওপর পড়েছে মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকাময় কৃষ্ণচ্ছায়া। গভীর নিয়তিবিধানের অনুভূতি নিয়ে ভারতীয় বন্ধু পাঁচজন তাকালেন চীনের উর্বর মৃত্তিকা থেকে আকাশের দিকে। সুস্পষ্ট রক্ত-রেখা-চিহ্নিত তিনটি জাপানী বোমাবর্ষী বিমান অশিব শকুনীর মত নীচে নেমে এল ; ক্ষণকালের জন্য জাহাজের মাথার ওপর স্তব্ধ হয়ে থেকে তারা উড়ে চলে গেল দূরে।

"নয়-এক-আট"

"স্বাধীন এবং দৃপ্ত চীনবাসীগণ !
নক্ষত্র হোক তোমাদের অঙ্গ-ভূষণ—
বন্ধুর ভূমি কর্ষণ ক'রে
লাভ কর তোমাদের শ্রমের শস্য-সম্পদ্ ।
সংগ্রাম কর স্বদেশের জন্য,
স্বাধীনতা ঐ এল ব'লে ।
মানুষকে উপনীত হ'তে হবে
বিশ্ব-শান্তির মহান্ তীর্থে—
যেখানে নভোনীলিমায় রবির সিত-কিরণ,
উজ্জ্বল পতাকার লোহিত ক্ষেত্র যেখানে ।"

—চীনের জাতীয় পতাকা-সঙ্গীত ।

দক্ষিণ চীনের প্রধান নগর ক্যান্টন একদিন ছিল শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র । কিন্তু আজ সে নগর রণবিধ্বস্ত ! বড় বড় অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে কিংবা গুলিবর্ষণে ছিদ্রবিচ্ছিদ্র দেওয়ালের ওপর ভর দিয়ে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে আছে ; স্কুল এবং হাসপাতাল পর্যন্ত রেহাই পায় নি এই ব্যাপক ধ্বংসের হাত থেকে—পূর্ব এশিয়ায় জাপানের "সভ্যতাদায়ী" অভিযানের এইগুলিই তিক্ত এবং মুখর স্মারক !

যাই হোক্, প্রয়োজনই উদ্ভাবনার উৎস ! ধ্বংসপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখেই গড়ে ওঠে আত্মরক্ষার কৌশল ! জাপ বোমারু বিমানের হাত থেকে বাঁচবার মত অস্ত্রসজ্জা

ক্যাণ্টনের ছিল না ; এমন কি বিমান হানার হাত থেকে রক্ষা পাবার মত আশ্রয়-স্থানের সংখ্যাও ছিল নিতান্ত অপ্রচুর। তাই ক্যাণ্টনের অধিবাসীরা পতনশীল বোমার গতিরোধ করবার জন্য নিজেদের বাড়ীর ওপর কতগুলি বাঁশের ছাদ তৈরী করেছিল—নিরাপত্তার এ কৌশল যেমন শোচনীয়, তেমনি অনুন্নত। তবু এ কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। যে ক'টি বাড়ী তখনও অক্ষত ছিল, তাদের বাঁচিয়েছিল এই ভঙ্গুর, কিম্ভূত-কিমাকার বাঁশের ছাদ !

দক্ষিণ-পূর্ব চীনে যুদ্ধের গতি তখন অনবরতই জাতীয় সেনাদলের প্রতিকূলে চলেছে। ইতিমধ্যেই গুজব রটেছিল যে ক্যাণ্টন থেকে বে-সামরিক অধিবাসীদের সরিয়ে নেওয়া হবে ; সম্ভবতঃ সহরটি একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে।

মিশনের ক্যাণ্টনে পৌঁছাবার পরদিন—১৮ই সেপ্টেম্বর—১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মুক্দেন-ঘটনার সপ্তম বার্ষিকী। এই ঘটনা শুধু চীনের ওপর জাপানী আক্রমণেরই সূচনা করে নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও প্রারম্ভিক বলা যেতে পারে একে। জাতীয় অবমাননার স্মারকরূপে প্রতি বৎসর এই বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সাধারণতঃ একে বলা হয় "চিউ-ই-পা" ("নয়-এক-আট," অর্থাৎ নবম মাসের অষ্টাদশ দিবস)।

"নয়-এক-আট !" "নয়-এক-আট !!" এই তারিখটি চীনের জাতীয় চেতনায় অগ্নি-অক্ষরে লেখা রয়েছে, স্মৃতিপটে আঁকা শপথের মত। এই অনুষ্ঠান এবং এই ধরণের অন্যান্য

শোচনীয় ঘটনার বার্ষিকীর মধ্য দিয়ে চীনারা শত্রুর প্রতি তাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে সর্বদা জাগিয়ে রাখে।

ক্যান্টন সহরে ১৯৩৮ সনের "নয়-এক-আট" দিবসের সূত্রপাত হ'ল খুব উপযুক্ত ভাবেই—বিমান হানার সঙ্কেত-ধ্বনির মধ্য দিয়ে। মিশনের সভ্যরা এর পর যতদিন চীনে ছিলেন, তার মধ্যে এ রকম সঙ্কেতধ্বনি শত শত বার শুনেছেন। কিন্তু এই তাঁদের প্রথম অভিজ্ঞতা! ক্রমে তাঁরাও চীনাদেরই মত বিমানহানা সম্বন্ধে বেশ নির্বিকার হ'তে শিখেছিলেন; কিন্তু সেদিন যখন তাঁরা সঙ্কেতধ্বনি শুনে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠেন, তখন তাঁরা রীতিমত ভয় পেয়েছিলেন। বাইরে রাস্তায় কিন্তু আতঙ্ক বা ব্যস্ততার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। বেশ শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন পদক্ষেপে যে যার কাজে চলেছে। ক্যান্টনে এতবার বিমান-হানা হয়ে গেছে, যে স্থানীয় অধিবাসীরা সঙ্কেতধ্বনি শুনে আর ভয় পেত না। পরে জানা গেল, সেদিন শুধু সতর্কতার জন্য সঙ্কেতধ্বনি করা হয়েছিল। সহর থেকে দূরে জাপবিমান দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তারা সেদিন সহরের ওপর হানা দেয়নি। খানিকক্ষণই পরেই নিরাপত্তার সঙ্কেত ধ্বনিত হ'ল।

বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক গান্ধীটুপি ছাড়া আগাগোড়া খাকির সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে তাঁরা একখানা য়্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে ক'রে সহর দেখতে বেরোলেন। গাড়ীখানার

আগাগোড়া গুলির আঘাতে ছিদ্রবিচ্ছিদ্র—খুব নীচু থেকে একখানা জাপানী বিমান এর ওপর গুলি চালিয়েছিল। গাড়ীর ছাদে এবং দু'পাশে যে বড় বড় ক'রে রেড্ক্রশের চিহ্ন আঁকা ছিল, তা তারা গ্রাহ্যও করে নি।

প্রথমেই তারা গেলেন একটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে। মাঞ্চু সম্রাটদের শাসনকালে যে বাহাত্তর জন বিদ্রোহী বীর কোআন্টুঙ্ প্রদেশের শাসনকর্তাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদেরই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই স্তম্ভ। বাহাত্তর জন শহীদের উদ্দেশ্যে বাহাত্তরটি পাষাণ-ফলকে গড়া এই স্তম্ভে তারা ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাল্যদান করলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সাংহাইতে জাপানীদের সঙ্গে সংঘর্ষে "উনবিংশ পন্থা বাহিনীর" যাদের মৃত্যু হয়েছিল, সেই শহীদদের সমাধির ওপরেও তারা মাল্যার্পণ করলেন। তারপর সুসজ্জিত "সান্ ইয়াৎ-সেন মেমোরিয়াল হলে" যেয়ে তাঁরা চীন গণতন্ত্রের স্থাপয়িতার তৈলচিত্রকে মাল্যভূষিত করলেন। একটি বোমার আঘাতে তৈলচিত্রটির খানিকটা ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু নীরব শ্রদ্ধাভরে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের মনে হ'ল, চীনা দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ে হৃদয়ে সান্ ইয়াৎ-সেনের যে-ছবি আঁকা রয়েছে, জাপানীরা কখনও সে-ছবি মুছে দিতে পারবে না।

সন্ধ্যাবেলা "নয় এক-আট" বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক বিরাট শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করল। পথের ধারে

স্থানে স্থানে জনসভা হল। এ সব সভার বক্তারা অধিকাংশই তরুণ বালক-বালিকা। সাত বছর আগের সেই জাতীয় অপমানের কথা উল্লেখ ক'রে তারা আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলল, শত্রুর সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ না দিয়ে চীনের জনগণ কিছুতেই শান্ত হবে না। শ্রোতারা যে রকম উৎসাহ সহকারে এই সব বক্তাদের সমর্থন করছিল, তাতে এ বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না, যে চীনের গণচিত্তে প্রতিরোধ-শক্তি জাগ্রত। সেই শক্তিই দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত জাপানী রণনীতির উদ্যত উপপ্লবকে প্রতিহত করছিল।

পথের মোড়ে মোড়ে নূতন জনপ্রবাহ শোভাযাত্রায় যোগ দিতে লাগল। এমনি ক'রে শোভাযাত্রাকারীদের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দু'লাখের ওপর দাঁড়াল। শোভাযাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল কতকগুলি গাড়ী—এই সব গাড়ীর গায়ে বড় বড় প্রাচীরচিত্রের সাহায্যে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জাতীয় প্রতিরোধ কাহিনীর বিভিন্ন প্রেরণাপূর্ণ দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

গোধূলির ম্লান আলো যখন রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, ছেলেমেয়েদের হাতে সহসা জ্বলে উঠল অসংখ্য মশাল—আশা এবং শাশ্বত দেশপ্রেমের দীপ্তিমান্ প্রতীক! শত্রুর প্রতি দৃপ্ত বিরোধিতা এবং দেশের প্রতি উদ্দীপক আহ্বানের বাণী নিয়ে সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল "চিলাই" এবং অন্যান্য জাতীয় সঙ্গীত। রাতের আকাশ

ভরে উঠল সেই বাণীতে। "চিলাই!" "চিলাই!!" জাগো! জাগো!! জাগো, মহাচীনের বলীয়ান্ সন্তানগণ! জাগো কনফ্যুসিয়াসের বংশধরেরা! জাগো শ্রমিক ও ছাত্র, কবি ও শিল্পী! চীনের নারী ও শিশুরা জাগো! মাতৃভূমির এই সঙ্কটলগ্নে তোমরা সবাই জাগো! দুর্বৃত্ত শত্রুরা তোমাদের দেশ কেড়ে নিচ্ছে, তোমাদের বাস্তুভিটা উৎসন্ন করছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে তোমাদের শ্রমের ফসল, অপমান করছে তোমাদের মাতা, ভগ্নী ও দুহিতার। উদগ্র ক্রোধবহ্নি নিয়ে তোমরা জেগে ওঠ। ধ্বংস কর স্বাধীনতার শত্রুদের! ওঠ, জাগো, প্রতিশোধ নাও এই অত্যাচারের।

এই অনুষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত আবেগ হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করে। মিছিল ভেঙ্গে যাবার পরেও বহুক্ষণ ধ'রে নগরীর জনহীন পথে এই সঙ্গীত, এই আহ্বানের রেশ জেগে রইল। এই "নয়-এক-আট" দিবসে চীনের জনসাধারন যে ভাবে তাদের বিগত অবমাননার স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে প্রতিশোধের সংকল্প গ্রহণ করল, তারই স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল মিশনের সভ্যদের অন্তরে। চীনে তাদের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিরতরে জড়িত হয়ে গেল এই স্মৃতি!

মাদাম সান্ ইয়াৎ-সেন্

"মাদাম চিয়াংকে যদি বলা হয় স্বঙ্ বংশকিরীটের উজ্জ্বল রত্ন, মাদাম সান্‌কে তুলনা করা চলে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে। গোপনে যে ফুল ফোটে, তারি সঙ্গে তিনি তুলনীয়া। শিল্প-শোভায় দীপ্ত চীনেমাটির টুকরোর কথা কথা মনে পড়ে তাঁকে দেখলে। আত্মিক শক্তির নিরবচ্ছিন্ন উৎস তিনি। তিনি যেন ছায়ার আড়ালে ভাস্বর বহ্নিশিখা।"

—জন্ গান্থার (ইনসাইড্ এশিয়া)।

ক্যাণ্টন বন্দরে ভারতীয় চিকিৎসকদের অভ্যর্থনা জানাতে জাহাজে এসেছিলেন ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের বিধবা পত্নী স্বঙ্ চিং-লিং। সাদাসিধে একটি কালো গাউনেই এই তন্বঙ্গী সুন্দরীকে বেশ মানিয়েছিল। ইংরাজি বলেন তিনি চমৎকার, তবে উচ্চারণে একটু মার্কিনী টান আছে। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত আগমনে মিশনের সভ্যরা যেমন আনন্দিত হ'লেন, তেমনি সম্মানিত বোধ করলেন; কারণ মাদাম সান্ ইয়াৎ-সেন আধুনিক চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় নেত্রী। এর মূলে যেমন তাঁর পরলোক স্বামীর আদর্শ রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাঁর নিজের অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তাঁরা তিন বোন; তিনজনই চীনের জাতীয় জীবনে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর বড় বোন মাদাম কুঙ্ চীনের প্রধান মন্ত্রীর পত্নী, আর ছোট বোনের সঙ্গে মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের বিবাহ হয়েছে। চীনের জনসাধারণ, বিশেষ ক'রে তরুণ বামপন্থী ও কম্যুনিস্টরা তাঁকে যেমন

শ্রদ্ধা করে, তেমনিই ভালবাসে। বোনেদের অথবা মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের তুলনায় মাদাম সানের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মতামত বিশেষ ভাবে বিপ্লবপন্থী। বাইরের জগতে তাঁর ছোট বোনের খুবই খ্যাতি আছে, কিন্তু তাঁর চেয়ে মাদাম সান্ রাজনীতির খবর রাখেন অনেক বেশী; তাঁর মতামতের প্রকাশ-ভঙ্গীও অনেক বেশী ওজস্বী। চীনসরকারে মাদাম সানের স্থান খুব উঁচুতে- কুওমিনটাঙ্গের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির তিনি সভ্যা। ব্যক্তিগতভাবে এবং আদর্শের দিক দিয়েও আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ অনেক দিনের। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। যুদ্ধকালীন চীনে বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার যে মিলন, এ যেন তারই প্রতীক।

মাদাম সানের সঙ্গে এসেছিলেন মাদাম লিআও চুংকাই নামে একজন মহিলা-চিকিৎসক, ক্যাণ্টন ট্রেড্ য়ুনিয়নের সম্পাদক এবং আরও কয়েকজন সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু এই জনতার মধ্যেও মাদাম সানের বৈশিষ্ট্য সহজেই নজরে পড়ল। প্রাণ-প্রাচুর্য্য এবং চারিত্রিক শক্তির দীপ্তিতে এই ক্ষীণকায়া মহিলার চোখমুখ ছিল উদ্ভাসিত। তাঁর সঙ্গে ভারতীয় চিকিৎসকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁকে দেখলে মনে হয় যে তাঁর বয়স খুবই অল্প। তিনি যখন সাগ্রহে তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করছিলেন, তখন তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন

না যে তাঁর বয়স বাস্তবিকই পঞ্চাশ বছর, তিনিই সেই বহুদর্শিনী বিপ্লব-নেত্রী এবং চীনগণতন্ত্রের স্থাপয়িতার জীবন-সহচরী। এর পর তাঁরা যখন তাঁকে "নয়-এক-আট" দিবসের শোভাযাত্রার পুরোভাগে দেখেন, তখন তাঁদের মনে হয়েছিল, এই মহীয়সী মহিলা যেন চীনের অপরাজেয় আত্মার প্রতীক।

ক্যাণ্টনে তাঁরা এক সপ্তাহ কাটালেন। এখানেও তাঁরা বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও আতিথেয়তার পরিচয় পেলেন। জাহাজঘাট থেকে এক মিছিল ক'রে তাঁদের নির্দিষ্ট আবাস স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। মিশনের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য চীনা স্কাউট-বালিকারা এই মিছিলে যোগ দিয়েছিল। ক্যাণ্টনে তাঁদের অনেকগুলি ভোজ সভায় সম্বর্দ্ধিত করা হয়। এই সব ভোজ সভায় চীনের অনেক বিশিষ্ট সেনানায়ক, শাসন-কর্তা, রাষ্ট্রকর্মী, কুওমিনটাঙের কর্মকর্তা, চকিৎসক এবং বিদ্বান্ উপস্থিত হন। তাঁরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যপান করেন এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে চীনের নৈতিক সমর্থনের কথা ঘোষণা ক'রে বক্তৃতা দেন। ক্যাণ্টনের মেয়র মিশনকে সম্বর্দ্ধিত করবার জন্য যে প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেন, সেইটিই এই ধরণের অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয়। খ্যাতনাম্নী বৃটিশ সমর-সংবাদ-দাত্রী শার্লট হ্যাডন্ অন্যতম অতিথিরূপে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাদাম সানের বিশিষ্ট

পদমর্যাদার কথা বিচার ক'রে তাঁকেই এই ভোজ সভার নেত্রী মনোনয়ন করা হয়। তিনি ডাঃ অটল ও মিশনের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সম্বন্ধে, অনেক আলোচনা করেন। জওহরলালের সঙ্গে তাঁর মস্কোতে দেখা হয়েছিল, সেই সময় থেকেই তিনি তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন*। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় দিলেন এবং ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানালেন।

তাঁর করুণা ও সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া গেল একটি ঘটনায়। তিনি লক্ষ্য করলেন যে ভারতীয় অতিথিরা 'চপ্‌স্টিক্' (যে দু'টি কাঠি দিয়ে চীনারা ভাত খায়) দিয়ে কিছুতেই খেতে পারছেন না। স্থানীয় রীতি মানবার চেষ্টা ক'রে তাঁরা একটি হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা করছিলেন, তা ছাড়া এ ভাবে যে তাঁরা ক্ষুধা-নিবৃত্তি করতে পারবেন,

* এক বছর পরে চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লেখেন :—

"মাদাম সান ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে দেখা হ'ল না ব'লে আমার মনে দুঃখ রয়ে গেল। চীনে যিনি বিপ্লবের জন্মদাতা, সেই সান্ ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর থেকে এই মহীয়সী মহিলাই বিপ্লবের অগ্নি-শিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছেন—তিনিই এই বিপ্লবের প্রাণ-! বার বছর আগে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করবার ইচ্ছা পোষণ ক'রে আসছি। পৃথিবীতে যাঁরা বরণীয়, তিনি তাঁদেরই একজন। তিনি ছিলেন হংকং-এ; দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে যাওয়া আমার হয়ে ওঠে নি।"

—*China, Spain & War*

এমন সম্ভাবনাও বিশেষ ছিল না। শোনা যায়, একবার একজন ভারতীয় রাজা যাতে অপ্রস্তুত না হন, এইজন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর দেখাদেখি প্লেট থেকে চুমুক দিয়ে 'সূপ' খেয়ে ছিলেন। মাদাম সান্ও ঠিক সেইভাবে এগিয়ে এলেন ভারতীয় অতিথিদের এই অপ্রতিভকারী অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য।

'চপ্‌স্টিক্' সরিয়ে রেখে তিনি হাত দিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন এবং সবাইকে শুনিয়ে বললেন, "ভগবান আমাদের হাত দিয়েছেন খাবার জন্যই তো।" তাঁর দেখাদেখি সবাই হাত দিয়ে খেতে আরম্ভ করল।

* * * *

যে সাতদিন তাঁরা ক্যাণ্টনে ছিলেন, তার মধ্যে মিশনের সভ্যেরা একটুও বিশ্রাম পাননি। অজস্র কাজের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কেটেছে তাদের দিনগুলি। বহু জনসভা ও সম্বর্দ্ধনা-অনুষ্ঠানে তাঁদের যোগ দিতে হয়েছে। তা ছাড়া সহরের যে দু'টি বড় হাসপাতাল আছে, চিকিৎসক-সুলভ আগ্রহ নিয়ে তাঁরা সে দু'টি দেখতে যান। সামরিক হাসপাতালটি উপযুক্ত যন্ত্রাদিতে সুসজ্জিত এবং বেশ আধুনিক। বেসামরিকদের জন্য সান্ ইয়াৎ-সেন মেমোরিয়াল হাসপাতালটিকে তাঁরা দেখলেন বিমানহানায় আহতদের ভিড়ে ভর্তি। জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে কাজ চালানো গোছের যে-সব ডাক্তারী যন্ত্রপাতি তখন চীনে তৈরী হচ্ছিল,

এখানে তাঁরা সেগুলি দেখবার সুযোগ পেলেন। তাঁরা দেখলেন, আহতদের সংখ্যা এত বেশী যে মুষ্টিমেয় চীনা ডাক্তার দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেও পেরে উঠছেন না। হাসপাতালের প্রতিটি কামরা, বারান্দা, এমন কি উঠান পর্যন্ত ভরে উঠেছে হাজার হাজার আহত নর-নারী ও শিশুতে। এই দৃশ্য দেখে তাঁরা বুঝতে পারলেন, ডাক্তার এবং চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জামের জন্য চীনের দরকার কত জরুরী। তাঁরা নিজেরা মাত্র পাঁচজন; ওষুধ-পত্র তাঁদের সঙ্গে যা আছে, তাতে এক বছরও চলবে না—অথচ চীনের দরকার আরও অন্ততঃ পাঁচ হাজার ডাক্তার এবং লক্ষ লক্ষ বাক্স ওষুধ ও যন্ত্রপাতি! এ কথা তাঁদের মনে হ'ল; তবু নিজেরা শীগগিরই যে-কাজ সুরু করবেন, তাতে চীনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কিছুটাও সাহায্য হবে, এই কথা ভেবে তাঁরা একটু শান্তি পেলেন।

চিকিৎসা-ব্রতী হিসেবে তাঁরা জাপানীদের কাছে কি প্রত্যাশা করতে পারেন, তার ভয়াবহ নিদর্শন তাঁরা দেখতে পেলেন এই "সান্ ইয়াৎ-সেন মেমোরিয়াল" হাসপাতালে। রেড্-ক্রশ যে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়, একথা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত; কিন্তু জাপানীরা এ কথা গ্রাহ্য করে না। তাঁরা দেখলেন, হাসপাতালের খানিকটা অংশ বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাসপাতালের প্রাঙ্গণে কতকগুলি পরিখা খনন করা হয়েছিল—এর পর

থেকে বিমানহানার সঙ্কেতধ্বনি হ'লেই রোগীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

ক্যাণ্টন থেকে বিদায় নেবার আগেই তাঁদের একবার বিমান-আক্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হ'ল। নগরবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্য একটি সভা যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই সময় বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি হয়। এই প্রথম তাঁদের মাটির নীচে আশ্রয়-কক্ষে প্রবেশ করতে হ'ল। সহরের যে-সব অঞ্চলে বোমা পড়ছিল, সেইসব অঞ্চল থেকে বজ্রগর্জনের মত শব্দ তাঁদের কাণে ভেসে এল। প্রথমটা যে তাঁরা বেশ ভয় পেয়েছিলেন, এ-কথা পরস্পরের কাছে স্বীকার করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি। তবে সেই আশ্রয়-কক্ষে তাঁদের যে-সব চীনা বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নির্বিকার, প্রশান্ত ভাব দেখে বিমান-আক্রমণে অনভ্যস্ত ভারতীয় চিকিৎসকরা যথেষ্ট আশ্বস্ত হ'লেন। আশ্রয়-কক্ষ থেকে বেরোবার আগেই তাঁদের প্রথম ভয়ের ধাক্কা পুরোপুরি কেটে গেল।

ক্যাণ্টনে মাঝে মাঝে বেশ হাস্যকর অভিজ্ঞতাও তাঁদের হয়েছে। চীনা ভাষা তাঁরা তখনও তেমন আয়ত্ত ক'রে উঠতে পারেন নি। কোন দোভাষীকে সঙ্গে না নিয়ে তাঁরা যখন মাঝে মাঝে সহরে বেড়াতে বেরোতেন, তখন সময় সময় এজন্য তাঁদের বেশ অদ্ভুত অবস্থায় পড়তে হ'ত। একদিন কোট্‌নিস্, বসু ও মুখার্জি একটা চীনা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছেন।

যে মেয়েটি তাঁদের পরিবেশন করছিল, সে মোটেই ইংরাজি জানে না। কোট্‌নিস্‌ মনে করতেন, চীনা ভাষায় তাঁর খুব দখল আছে ; কিন্তু "মুরগী" কথাটি চীনা ভাষায় বোঝাবার মত দক্ষতা তাঁর তখনও হয়নি। বন্ধুত্রয় তখন মনোভাব প্রকাশের জন্য চিত্রকলার সাহায্য নিলেন। তিনজনে মিলে খাদ্যতালিকার বিপরীত পৃষ্ঠে যে ছবিটি আঁকলেন, তাঁদের মতে সেটি একটি মুরগীর খুব নিখুঁত, প্রায় জীবন্ত ছবি! মেয়েটি এমন ভাব দেখাল যেন সে সব বুঝেছে। খানিকক্ষণ বাদে সে খুব গর্বিত ভাবে নিয়ে এল—বেশ ভাল ক'রে ভাজা একটি ব্যাঙ্‌।

তেইশে সেপ্টেম্বর ভোর চারটের সময় সুপ্ত ক্যাণ্টন সহর থেকে সাতখানা 'য়্যাম্বুলেন্স ট্রাক্‌' ছাড়ল। বিমান-আক্রমণের ভয়ে পরস্পরের মধ্যে দু'শ গজেরও বেশী তফাৎ রেখে গাড়ীগুলি গ্রামের পথ দিয়ে এগিয়ে চলল। এমনি ক'রে ভারতীয় মেডিকাল মিশন হুনান প্রদেশের রাজধানী চ্যাংশার দিকে রওনা হ'লেন। সেখানে পৌঁছেই তাঁদের কাজ সুরু করবার কথা।

অপরাজেয় চীন

" 'স্থবির' চীনারাই এ-যুদ্ধে জয়ী হবে, কারণ আসলে তারা প্রগতিশীল। নতুন ক'রে নিজেদের তারা গড়ে তুলছে।"

—ওয়েন ল্যাটিমোর।

ক্যান্টন থেকে চ্যাংশা আটশ মাইলের পথ। কখনো সমভূমি, কখনো বা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে গেছে এই পথ; পথের মাঝে মাঝে ভয়ানক বাঁক; পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে পড়ে রয়েছে মোটর গাড়ীর ধ্বংসাবশেষ; সদ্য বিমান আক্রমণের পর পথের ধারে সহর এবং গ্রামের বাড়ীঘর দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে; বোমার আঘাতে পুল ভেঙ্গে পড়েছে; মাঝে মাঝে পাইন-বনে ঢাকা পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধানক্ষেত; মাঝে মাঝে তুষার-শীতল স্বচ্ছ নির্ঝরিণী—এই সে পথের দৃশ্য! অজস্র বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত রেলপথ কখনো এই পথের গা ঘেঁসে চলেছে, কখনো বা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে। এই পথে চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে ক্লান্তিহীন চালকরা রাত্রিদিন গাড়ী চালাচ্ছিল—সামনের পথের ওপর তাদের দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। গাড়ীগুলি সবসময়েই পরস্পরের সঙ্গে দু'শ গজেরও বেশী দূরত্ব বজায় রাখছিল, কারণ যে কোন মুহূর্তে আকাশে জাপানী বোমারু বিমানের আবির্ভাব ঘটতে

পারে—অনেকগুলি গাড়ী একসঙ্গে থাকলে তারা বোমা ফেলবার একটি চমৎকার লক্ষ্যস্থল পাবে।

মিশনের সঙ্গে ছিলেন ডাঃ ওআঙ্গ্ এবং ক্যানাডার ডাঃ হ্যারিসন। এঁরা ছ'জনেই রেড্ক্রশের কর্মী। যানবাহন-বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী মিঃ উ এবং মিস্ রুবেন্স্ নামে একজন মার্কিন মহিলা সাংবাদিকও তাঁদের সঙ্গে চলেছিলেন। চীনের কল্যাণকামনাই এই বিভিন্ন দেশীয় জনতাকে একত্র এনেছিল।

পঁচিশে সেপ্টেম্বর তাঁরা চ্যাংশায় পৌঁছালেন। চ্যাংশা একটি প্রাদেশিক রাজধানী, আয়তনে প্রায় নাগপুরের সমান। সহরটি প্রাচীন ধরণের; এখানকার সরু সরু আঁকাবাঁকা গলিগুলি কাশীর কথা মনে করিয়ে দেয়। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এখানকার সব রাস্তার ওপর ছাউনি দেওয়া। প্রত্যেকটি বাড়ীর গায়েই বোমার চিহ্ন।

ভারতীয় চিকিৎসকরা কিন্তু এ-সহরের গঠন-বৈচিত্র্য দেখবার বেশী অবকাশ পেলেন না। একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল—সেখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'ল তাঁদের আসল কাজ, যে কাজের জন্য তাঁদের চীনে আসা। ভোজ, প্রশস্তি, সম্বর্দ্ধনা ইত্যাদির পালা শেষ হয়ে কাজ সুরু হওয়াতে তাঁরা খুবই আনন্দিত হ'লেন।

তাঁদের জানান হ'ল, চীনের জাতীয় রেড্ক্রশের

পরিচালনায় যে মেডিকাল রিলিফ কমিশন আছে, তার প্রধান কর্মকর্তা ডাঃ রবার্ট লিমের অধীনে তাঁদের কাজ করতে হবে। ডাঃ লিমের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরা দেখলেন যে তিনি চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সকলেরই প্রীতিপাত্র। এই রকম একজন লোকের অধীনে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে তাঁরা আনন্দিত হ'লেন। ডাঃ লিম্ নিজে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ; এডিনবরা থেকে তিনি সসম্মানে চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যুদ্ধের আগে তিনি পীপিং মেডিকাল কলেজে অধ্যাপনা করতেন। খর্ব, কৃশকায় এই ভদ্রলোকটির চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট। সামরিক পোষাকেও তাঁর সে বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ে নি। তিনি চমৎকার শুদ্ধ ইংরাজি বলেন, এবং সব বিষয়েই অত্যন্ত প্রগতিশীল মত পোষণ করেন। তাঁর দেশপ্রেম এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যেই চীনের মেডিকাল রিলিফ কমিশন গড়ে উঠেছে। যে রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, সে অবস্থায় পড়লে তাঁর চেয়ে কম দৃঢ়তাসম্পন্ন যে কোন লোকই হতাশ এবং অবসন্ন হয়ে পড়তেন। তাঁর অসামান্য সাহস ও আত্মত্যাগের কাহিনী আজ চীনের সর্বত্র প্রবাদে পরিণত হয়েছে। নান্‌কিঙ্ থেকে চীনারা যখন হটে যাচ্ছিল, তখন তিনি কি-ভাবে প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে শত শত নরনারীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন, সে কাহিনী লিন্ ইউটাঙ্ তাঁর উপন্যাস "এ লীফ্ ইন্ দি স্টর্ম"-এর একটি পাত্রের

মুখে বিবৃত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, ১৯৪২ খৃস্টাব্দে চীনা অভিযানকারী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার পর তিনি সেই বাহিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

জাপানের সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন চীনের দশ হাজার ডাক্তারের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন মাত্র দু'হাজার। তার মধ্যে মোটামুটি এক হাজার জন সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন, অর্থাৎ দু'হাজার সৈন্য পিছু মাত্র একজন ক'রে ডাক্তার ছিলেন। ডাঃ লিম্ তাঁর তৎকালীন এবং প্রাক্তন সমস্ত ছাত্রকে নিয়ে মেডিকাল রিলিফ কমিশন সংগঠন করলেন। এই কমিশন কতকটা রেড্ক্রশের আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজনবোধে কমিশন সেনাদলের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে সামরিক হাসপাতালে কিংবা রণাঙ্গণে ভ্রাম্যমান 'য়্যাম্বুলেন্স ইউনিটে' কাজ করে।

মেডিকাল রিলিফ কমিশনের কাজ পাঁচভাগে বিভক্ত— চিকিৎসা, শুশ্রূষা, 'য়্যাম্বুলেন্স,' রোগ-প্রতিষেধ এবং 'এক্সরে'। প্রত্যেক বিভাগে আবার কয়েকটি ক'রে ইউনিট থাকে। প্রত্যেকটি চিকিৎসাকারী ইউনিটে থাকেন পাঁচজন ক'রে ডাক্তার। এ ছাড়া নার্স, ড্রেসার, আর্দালি, একজন পাচক ও একজন 'কোয়ার্টার-মাস্টার' থাকে প্রত্যেক ইউনিটে। ভারতীয় মিশনের সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক লোকজন এবং ইংরাজি-জানা পুরুষ নার্স দিয়ে এর নাম রাখা হ'ল "পঞ্চদশ চিকিৎসাকারী (ভারতীয়) ইউনিট"। কাজ স্বুরু করবার

আগে মিশনের সভ্যরা যাতে মেডিকাল রিলিফ কমিশনের গঠন পদ্ধতি ভাল ক'রে বুঝে নিতে পারেন, সেই জন্য তাঁদের বলা হ'ল হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরতে। নূতন ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য ডাঃ লিম্ যে সব বক্তৃতা দিতেন, সেগুলিও তাঁদের শুনতে বলা হ'ল।

সামরিক হাসপাতালে যে মুষ্টিমেয় তরুণ চীনা ডাক্তার অসংখ্য রোগীর তত্ত্বাবধান করেছিলেন, তাঁদের নৈপুণ্য ও কর্তব্যপরায়ণতা দেখে ভারতীয় ডাক্তাররা বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হলেন। রেড্-ক্রশের যানবাহন বিভাগে যে সমস্ত গাড়ী ছিল, তার অধিকাংশই ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থান থেকে দেশপ্রেমিক প্রবাসী চীনারা দান করেছিলেন। সহানুভূতিশীল বিদেশী বন্ধুদের দানও তার মধ্যে কিছু ছিল। ভারতীয় কংগ্রেস যে য়্যাম্বুলেন্স ট্রাক্ ও কার পাঠিয়েছিল, তাও এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল।

একদিন মোটরে ক'রে যাবার সময় বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি শুনে ভারতীয় ডাক্তাররা তাড়াতাড়ি 'ট্রেঞ্চে' আশ্রয় নিলেন। তবে জাপানী বিমান সেদিন এসেছিল সহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে, তাই বোমা আর সেদিন পড়ল না। ডাক্তাররা যে 'ট্রেঞ্চে' আশ্রয় আশ্রয় নিয়েছিলেন তার পাশেই কতগুলি পুরানো 'ট্রেঞ্চ' দেখে তাঁরা বিস্মিত হ'লেন। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে তাঁরা শুনলেন যে ১৯৩০ খৃস্টাব্দে চীনের "লালফৌজ" যখন চ্যাংশায় বিপ্লবের সূত্রপাত

করে, এই ট্রেঞ্চগুলি সেই সময়ের। বৃটিশ এবং মার্কিন নৌবহর নদীবক্ষ থেকে সহরের ওপর গোলাবর্ষণ ক'রে এই বিদ্রোহ দমন করতে সাহায্য করেছিল।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একজন আহত সৈন্যকে তুলে নেবার সময় নিহত জনৈক 'য়্যাম্বুলেন্স' কর্মীর স্মরণে অনুষ্ঠিত একটি শোকসভা মিশনের সভ্যদের বিশেষ প্রেরণা দিল। কর্মীটির মস্তিষ্কে গুলি লেগেছিল; আহত সৈন্যটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসবার কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র সতের বছর। এই বীর-বালকের পিতা একজন শ্রমজীবি। সমবেত জনতাকে সম্বোধন ক'রে শান্ত, সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমার যদি আরও ছেলে থাকত, তাদেরও আমি সানন্দে উৎসর্গ করতুম জাতির কল্যাণে।" যে মহান প্রতিরোধশক্তি এতদিন চীনকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা ক'রে এসেছে এবং তার নিশ্চিত বিজয়ের সূচনা করেছে, তারই অভিব্যক্তি হয়েছে এই বালকের আত্মোৎসর্গে এবং তার পিতার প্রশান্ত স্থৈর্যে।

এই শক্তিরই বিকাশ মিশন দেখতে পেলেন সাত থেকে পনের বছর বয়স্ক একদল বালক-বালিকার মধ্যে। একজন দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে তারা মিশনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সম্প্রতি এরা দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ছ'হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে ঘুরেছে। অনেক সময়েই এদের শত্রুব্যূহের পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। গান, বক্তৃতা

ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এরা গ্রামে গ্রামে স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করছিল। যে ছেলেটি এদের নেতা, তার বয়স চোদ্দও পোরেনি। মেডিকাল মিশন পাঠাবার জন্য ভারতের অধিবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সে একটি বক্তৃতা দিল। দলের ছেলেমেয়েরা সবাই খুব আগ্রহভরে মিশনকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করল।

এই যে বুদ্ধি-দীপ্ত, প্রাণ-চঞ্চল ছেলেমেয়েরা দেশের জন্য এই বয়সেই বাপ-মা, বাড়ী-ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, এরাই নবীন চীনের প্রতীক।

নরকের রাজপথ

"যুদ্ধের বিভীষিকা—গোলাগুলি, ট্যাঙ্ক, কামান অথবা বোমার বিভীষিকা—এই সবচেয়ে ভয়ানক নয়। আকাশ থেকে অতর্কিত বোমাবর্ষণ, মৃত্যুর রুদ্র রূপ, ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষ, এই সবচেয়ে ভীষণ নয়। সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই মানুষ রণক্ষেত্রে মানুষকে হত্যা ক'রে এসেছে। ......কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এ দৃশ্য কখনও দেখা যায় নি যে সৈনিকরা হাসতে হাসতে ছোট শিশুকে শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে, তারপর তীক্ষ্ণ কিরীচের মুখে তাকে লুফে নিচ্ছে। এক জাতির মানুষ আর এক জাতির ওপর কি নৃশংস অত্যাচার করতে পারে, এই হ'ল আসল বিভীষিকা।"

—লিন ইউটাঙ ("এ লীফ্ ইন্ দি ষ্টর্ম")।

চ্যাংশাতে মিশনের যে অভিজ্ঞতা হ'ল, সেটা ভূমিকা মাত্র—তাঁদের আসল কাজ স্থুরু হ'ল চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী হ্যাঙ্কাউ-য়ে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনখানা গাড়ীতে ক'রে "পঞ্চদশ চিকিৎসাকারী (ভারতীয়) ইউনিট" হ্যাঙ্কাউয়ের পথে রওনা হলেন। তাঁদের সঙ্গে চললেন চীনা রেড্ক্রশের যান-বাহন বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ উইলিয়াম উ। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই চারশ মাইলব্যাপী যাত্রাপথে তাঁরা যুদ্ধের বীভৎস, ভীতিপ্রদ রূপ প্রত্যক্ষ করলেন।

খেয়া নৌকায় নদী পার হয়ে দুপুর বেলা তাঁরা চুং-ইয়েন সহরে পৌঁছালেন। সহরের বাড়ী-ঘর পুড়ছে, দূর থেকেই তার ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। তিনদিন ধরে সেখানে অবিরত বিমান আক্রমণ চলছিল। তাঁদের পৌঁছাবার মাত্র আধঘণ্টা আগে একটি বড়রকমের আক্রমণ হয়ে গেছে। সহরের প্রায়

প্রতিটি বাড়ী ভূমিসাৎ হয়েছে। 'আগুনে বোমার' বিস্ফোরণে কতগুলি বাড়ী তখনও জ্বলছে। চারিদিকে অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি পচতে সুরু করেছে। সর্বশেষ বিমান হানাতেই অন্ততঃ দশজন নিহত হয়েছে, আহতের সংখ্যাও একশ'র কম নয়। সহরে খুব বেশী লোকজন নেই। মাঝে মাঝে ক্ষুধার্ত, কঙ্কালসার দু'চারজন লোক এবং দু'একটি কুকুর পথ দিয়ে চলেছে। মৃত্যুর ছায়ার মতই বিভীষিকাময় তাদের আকৃতি! চীনা রেড্ক্রশের কয়েকজন কর্মী এরই মধ্যে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীদের দু'টি ইউনিট যথাশক্তি আহতদের সেবা করছিল—কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তারা নিতান্তই নগণ্য। এরকম অবস্থা তখন চীনের শত শত সহরে। চুং-ইয়েনের শোচনীয় দুরবস্থা সমসাময়িক চীনের অবস্থারই প্রতীক।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে দক্ষিণ চীনে যুদ্ধের গতি জাতীয় বাহিনীর বিশেষ প্রতিকূলে ছিল। জাপানের দুর্দ্ধর্ষ, বিরাট সেনাবাহিনী তখন সমুদ্রোপকূলের নগরগুলি অধিকার ক'রে দেশের অভ্যন্তরে হানা দিয়েছে; ক্যাণ্টন এবং হ্যাঙ্কাউ দু'টি সহরই তারা অবরোধ করেছে। চলাচলের ব্যবস্থা আগে থেকেই খারাপ, তারপর ক্যাণ্টন-চ্যাংশা-হ্যাঙ্কাউ রেলপথের ওপর অনবরত বোমাবর্ষণ ক'রে জাপানীরা সে দুরবস্থা আরও শোচনীয় ক'রে তুলেছে। এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য সহরেই অবিরাম বিমানহানার ফলে ঠিক চুং-

ইয়েনের মত অবস্থা হয়েছে। দুর্দ্ধর্ষ যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে জাপানীরা ক্রমেই ইয়াংসি নদী ধরে এগিয়ে আসছে। স্থানে স্থানে বিপুল ক্ষতি স্বীকারের পর চীনাবাহিনী হটে যেতে বাধ্য হয়।

তাঁদের গাড়ীর চালক একবার পথ ভুলে উত্তরে না যেয়ে পূবদিকে যাবার দরুণ ভারতীয় চিকিৎসকরা এই শোচনীয় পশ্চাদপসরণের দৃশ্য দেখতে পান।

তাঁরা যেখানে উপস্থিত হলেন, তাকে বাস্তবিকই নরকের রাজপথ বলা চলে। আহত, অক্ষম, দুর্বল সৈন্যের দল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে পথে চলেছে শিবিরের হাসপাতাল লক্ষ্য ক'রে। নিজেদের উর্দি ছিঁড়ে তারা কোনরকমে ক্ষতস্থান বেঁধেছে। তাদের মধ্যে অনেকে কয়েকদিন যাবৎ কিছুই খেতে পায় নি ; তারা পথের পাশের ধানক্ষেত থেকে ধানের শীষ তুলে তাই চিবোবার চেষ্টা করছে। রোগে এবং পথশ্রমে অনেক এমন অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে তাদের চলবার শক্তি নেই। অনেকে পথের ধারেই শুয়ে পড়ছে—সেই তাদের শেষ শোওয়া। ক্ষুধায় এবং যন্ত্রণায় অনেকে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে। তারা বন্দুক দেখিয়ে মিশনের গাড়ী থামিয়ে খাবার চাইল এবং দাবী করল যে তাদের গাড়ীতে তুলে নিতে হবে। আরোহীদের পরিচয় পেয়ে তাদের অনুতাপের আর অবধি রইল না। নিতান্ত দুঃখের সাথে তারা বারবার তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। চীনে ভারতীয় মিশনকে যে-সব শোচনীয় দৃশ্যের

সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, তার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে মর্মন্তুদ। এর পরে তাঁদের আরো অনেক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে হয়েছে চোখের সামনে বোমার আঘাতে মানুষকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে তাঁরা দেখেছেন; হিংস্র যুদ্ধ এবং গেরিলাবাহিনীর অভিযানও তাঁরা দেখেছেন; রণাঙ্গণ থেকে এক মাইলের মধ্যে ব'সে তাঁরা আহত সৈন্যদের সদ্যশোনিতস্রাবী ক্ষতের পরিচর্যা করেছেন; জাপানী শান্ত্রীদের বন্দুকের পাল্লার মধ্য দিয়ে শত্রুব্যূহ অতিক্রম করবার অভিজ্ঞতাও এর পর তাঁদের কারও কারও হয়েছে। কিন্তু এই নরকের রাজপথ—আহত, রক্তাক্ত মানুষের এই যে অফুরন্ত মিছিল—এ তাঁদের মনে চিরদিনের মত যে ভয়াবহ ছাপ রেখে গেল, তার তুলনা তাঁরা সারা চীনে কোথাও খুঁজে পান নি।

দুঃখ-যন্ত্রণা যেখানে এত বেশী, এত মর্মান্তিক, সেখানে কয়েকজন ডাক্তার সমস্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও এমন আর কি করতে পারেন? তবু তাঁরা মাঝে মাঝে গাড়ী থামিয়ে আহত সৈনিকদের সাহায্য করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁদের যন্ত্রপাতি সব ছিল অন্য গাড়ীতে, তাই তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। খানিকক্ষণ পরে তাঁরা যেখানে পৌঁছালেন, সেখান থেকে রণক্ষেত্রের কামানগর্জন স্পষ্ট শোনা যায়। পথভুলের কথা বুঝতে পেরে তাঁরা এখান থেকে ফিরলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন। মাঝে মাঝে সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজের

শব্দ শুনে তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে তখনও তাঁরা যুদ্ধাঞ্চলেই রয়েছেন।

মিশ্‌মিশে অন্ধকারের মধ্যে খেয়া-নৌকায় ক'রে তাঁদের গাড়ীগুলি একটি ছোট নদী পার হ'ল। পরপারে পৌঁছে তাঁরা অস্ত্রবাহী রেলগাড়ীর আওয়াজ শুনতে পেলেন। এই শব্দে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে সে-অঞ্চল দিয়ে একটি বিরাট সেনাবাহিনী চলেছে। ডাঃ বসু অন্ধকারে নিজের গাড়ী চিনতে না পেরে যেই একবার টর্চলাইট জ্বালিয়েছেন, অমনি তাঁদের অধিনায়ক চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন "আলো নেভাও বলছি, বোকা কোথাকার!" এতক্ষণ যিনি খুব ভদ্র ব্যবহার করছিলেন, তাঁর মুখে এই ধমকের স্বর শুনে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে শত্রুসেনা খুব নিকটেই আছে। ডাঃ বসু না জেনে যে ভুল ক'রেছিলেন, তার ফলে তাদের কামানের গোলায় হাজার হাজার প্রাণ বিনষ্ট হ'তে পারত।

রাত সাড়ে দশটার সময় তাঁদের প্রথম গাড়ীখানা উচাঙে পৌঁছাল। সেখানে থেকে ইয়াংসি-কিয়াং নদী পার হ'য়ে তাঁরা হ্যাঙ্কাউয়ে পৌঁছালেন। হান্ এবং ইয়াংসি নদীর সঙ্গমস্থলে এই দু'টি নগর হাঙ্গেরির বুদা ও পেস্ত নগরদ্বয়ের মতই নদীর এপার ওপারে অবস্থিত। শিল্পপ্রধান উপকণ্ঠ হ্যানিয়াঙ্‌কে নিয়ে এদের মিলিত নাম হ'ল উ হান।

সহর থেকে মাত্র কয়েকমাইল দূরে "নরকের রাজপথে" তাঁরা যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছিলেন, তার সঙ্গে হ্যাঙ্কাউয়ের

অবস্থার আকাশ-পাতাল তফাৎ। আধুনিকতা ও প্রমোদের আবহাওয়ায় এ সহর পূর্ণ। অভিজাত হোটেল, দোকানে দোকানে বিলাসদ্রব্যের সম্ভার—কোন কিছুরই অভাব নেই। যে-কোন আধুনিক রাজধানীর মতই এখানকার কোলাহল-মুখর রাজপথে চঞ্চল জনতার গতিবিধি অফুরন্ত। সহরের অবস্থা দেখে হঠাৎ বোঝবার যো নেই যে শত্রুসৈন্য এ সহর অবরোধ করেছে—শুধু তাই নয়, শীগগিরই এখানকার অধিবাসীদের সহর ছেড়ে যেতে হবে। "যদি হ্যাঙ্কাউ ছেড়ে যেতে হয়" না ব'লে লোকে এরই মধ্যে বলতে স্বরু করেছে, "যখন হ্যাঙ্কাউ ছেড়ে যেতে হবে।" অথচ সহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় চিরাচরিত গতিতেই চলেছে।

তবু যুদ্ধের বিভীষিকা যে কত কাছে রয়েছে, ভাল ক'রে লক্ষ্য করলেই তা নজরে পড়ত। অনেক গৃহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত, আর অনেকগুলির গায়েই দেখা যেত বিমানহানার চিহ্ন! পরিচ্ছন্ন, স্নবেশ বণিক, আমলা ও ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে দেখা যেত ছিন্নবস্ত্রপরিহিত আশ্রয়প্রার্থীদের। এদের মধ্যে অনেকে শত শত মাইল পায়ে হেঁটে তবে হ্যাঙ্কাউয়ে পৌঁছেচে। "আশ্রয়ের সন্ধানে এত বড় জনতার যাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। ...বাড়ীঘর ছেড়ে সমুদ্রকূলের নগর থেকে এরা দলে দলে প্রবেশ করেছে দেশের অভ্যন্তরে। নদী অতিক্রম ক'রে, পর্বতমালা লঙ্ঘন ক'রে এরা এসেছে এই দুর্বোধ্য যুদ্ধে দুর্জ্জেয় শত্রুর নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচবার

জন্য।”* এরাও সেই “নরকের রাজপথ” দিয়ে এসেছে। সেই ভয়াবহ দৃশ্যের স্মৃতি, সেই মর্মান্তিক বেদনার অনুভূতি এদের মুখে চোখে সুস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছে!

হ্যাঙ্কাউয়ে পৌঁছাবার পরদিন তাঁরা ৬৪নং শিবির হাসপাতাল দেখতে গেলেন। হ্যাঙ্কাউয়ের হাসিমুখের আড়ালে যে বেদনার ছাপ রয়েছে, তার প্রমাণ তাঁরা এখানেও দেখতে পেলেন। সহরের যে অঞ্চলে আগে জাপানীদের বসতি ছিল, সেই অঞ্চলে এই হাসপাতালটি অবস্থিত। এটি আগে ছিল একটি জাপানী হাসপাতাল। তখন এখানে দু'শ রোগীর উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। এখন একে সামরিক হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে। গুরুতর ভাবে আহত প্রায় দেড় হাজার সৈন্য এখানে রয়েছে। জায়গার অভাবে তারা সবাই মেঝের ওপর ঘাসের মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আছে। সহরের অন্য অঞ্চলে আর একটি হাসপাতালে তাঁরা এর চেয়েও বেশী রোগীর ভিড় দেখলেন। সেখানে রোগীর সংখ্যা আড়াই হাজার। এত রোগীর জন্য না ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ-পত্র, আর না ছিল উপযুক্ত-সংখ্যক চিকিৎসকের ব্যবস্থা। ভারতীয় চিকিৎসকরা খুব সঙ্কট-মুহূর্ত্তেই তাঁদের ওষুধ-পত্র নিয়ে এখানে এলেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে নেওয়া হ'ল।

* লিন্ ইউটাং (এ লীফ্ ইন দি ষ্টর্ম)

পয়লা অক্টোবর থেকে তাঁরা কাজ সুরু করলেন। দু'টি হাসপাতালে কাজ করবার জন্য তাঁদের দু' দলে বিভক্ত করা হ'ল। এক দলে রইলেন চোলকার ও বসু, আর এক দলে কোট্‌নিস্‌ ও মুখার্জি। ডাঃ অটল চিকিৎসক হিসেবে এই দু'জায়গাতেই ঘুরে ঘুরে কাজ করতে লাগলেন।

সাতের দিন তাঁরা হ্যাঙ্কাউয়ে ছিলেন। এই ক'দিন তাঁরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন, এমন কি সময় সময় গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন চীনা ডাক্তার এবং জাভা 'য়্যাম্বুলেন্স' ইউনিটের কর্মীরা। এই ইউনিটও তাঁদেরই মত বিদেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবকরূপে এসেছিলেন।

চিকিৎসা-জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যেও তাঁরা এমন মর্মান্তিক যন্ত্রণার দৃশ্য আর দেখেন নি। যে-সব আহত সৈন্য তাঁদের চিকিৎসাধীনে ছিল, তাদের কারও হাত-পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, 'দমদম' বুলেটের আঘাতে কারও মুখের খানিকটা উড়ে গেছে, কারও বা তলপেটে এবং ফুসফুসে গুলি বিঁধেছে। নীরবে দারুণ যন্ত্রণা সইবার এমন ক্ষমতাও তাঁরা এর আগে আর কখনো দেখেন নি। সাফল্যমণ্ডিত অস্ত্রোপচার করবার পর বা যন্ত্রণানাশক কোন ওষুধ দেবার পর এই শান্ত রোগীদের চোখেমুখে যে কৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ প্রকাশ দেখতে পেতেন, তাতেই তাঁরা কৃতার্থ বোধ করতেন। বিনিদ্র রজনী এবং দীর্ঘ শ্রমের সমস্ত

কষ্ট তাঁরা তখন ভুলে যেতেন।

হ্যাঙ্কাউয়ে যখন তাঁরা ছিলেন, সেই সময় কয়েক বার সেখানে বিমানহানা হয়। কিন্তু এ ধরণের হানা তখন তাঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। চীনা সহকর্মীদের মতই নির্বিকার চিত্তে তাঁরা তখন এগুলিকে গ্রহণ করতে শিখেছেন। যুদ্ধের অবস্থা সে সময় খুবই আশঙ্কাজনক: জাপানীরা সবলে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। মিশনের তরুণ সদস্য তিনজন রণাঙ্গণে যেয়ে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। একদল চীনা ও বিদেশী সাংবাদিকের তখন রণাঙ্গণে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ এই দলের সঙ্গে তাঁদের পাঠাতে রাজী হ'লেন। কিন্তু কেমন ক'রে যেন এ-কথা খবরের কাগজে বেরিয়ে পড়ল। সেইজন্য তাঁদের যাত্রার ব্যবস্থা নাকচ করে দেওয়া হ'ল। সাংবাদিক এবং ডাক্তার দু'দলই এতে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেন। দার্শনিক-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন একজন চীনা ভদ্রলোক তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন "যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া হ'ল না ব'লে দুঃখ ক'রে লাভ কি? যুদ্ধক্ষেত্রই তো তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছে!"

বাস্তবিকই যুদ্ধক্ষেত্র হ্যাঙ্কাউয়ের দিকে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু সহরের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। আগের মতই সাড়ম্বরে বাজি পুড়িয়ে "শস্য-কর্তন" উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল। দু'দিন পরে এল "জাতীয় বিপ্লব

দিবস !” ১৯১১ খৃস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে মাঞ্চুবংশের পতন হয়—সেই দিনের স্মরণে প্রতি বৎসর এই বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। চারিদিকে সেদিন আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। জাতীয় পতাকা উড়িয়ে, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে বিপ্লব-দিবস পালিত হ’ল। মার্শাল চিয়াং কাই-শেক যখন সেনাদল পরিদর্শন করতে গেলেন, তখন কুচ-কাওয়াজ দেখবার জন্য সেখানে হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকেও সেদিন শুভ-সংবাদ এল। জানা গেল কিআংসি রণাঙ্গণে জাপানী সেনাবাহিনীর দু’টি ডিভিশন প্রায় ধ্বংস হয়েছে।

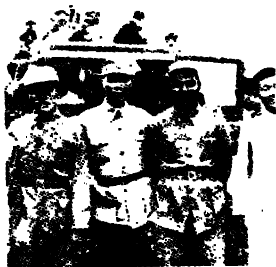
কিন্তু এরই মধ্যে হ্যাঙ্কাউ ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। পরদিনই ৮৭ নম্বর হাসপাতালটিকে হ্যাঙ্কাউ থেকে অনেক পশ্চিমে ইচাঙে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হ’ল। রোজই জাপানীদের অগ্রগতির খবর আসছিল। ডাক্তাররা চ্যাংশা থেকে টেলিফোনে খবর পেলেন যে শীগগিরই তাঁদের হ্যাঙ্কাউ ছেড়ে যেতে হবে। তাঁরা নিজেদের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন, এমন সময় বিমানহানার সঙ্কেতধ্বনি হ’ল। তারা শুনতে পেলেন যে সোভিয়েট বৈমানিকরা তাদের জঙ্গী-বিমান নিয়ে জাপানীদের বাধা দিতে যাচ্ছে। এই সোভিয়েট জঙ্গী-বিমানগুলিকে স্থানীয় লোকেরা “রুশ মৌমাছি” বলত। এই “মৌমাছি” ও রুশ বৈমানিকদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল খুব উচ্চ এবং এদের সম্বন্ধে তারা

বিশেষ গর্ব পোষণ করত। এই রুশ বৈমানিকরা এর আগেও জাপানীদের অনেক বোমারু বিমান ধ্বংস করেছে। আক্রমণকারীদের তারা সহজেই হঠিয়ে দিল। বিদেশী জাতির মধ্যে একমাত্র সোভিয়েট য়ুনিয়নই যে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র দিয়ে চীনের সাহায্য করছিল, এই ঘটনায় সে-কথা ভারতীয় ডাক্তারদের মনে পড়ল।

চোদ্দই অক্টোবর তাঁরা যাত্রার জন্য তৈরী হলেন। হ্যাঙ্কাউয়ের বেসামরিক অধিবাসীরা আগেই সহর ছেড়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু যে ষ্টীমারে তাঁদের যাবার কথা, সেই ষ্টীমারের যাত্রা হঠাৎ স্থগিত হওয়ায় তাঁরা আটকে পড়লেন। 'মেডিকাল ট্রেণিং স্কীমে' শিক্ষা নেবার জন্য যে দু'শ স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল, মিশনের ওপর তাদের পরীক্ষা করবার ভার পড়ল। এ কাজে তাঁদের যে দু'দিন লাগল, সেই দু'দিন জাপানী বিমানবহর সহরের ওপর বারে বারে হানা দিচ্ছিল। বিমান-বিধ্বংসী কামানের অবিরাম গর্জনে সে দু'দিন সহর ছিল মুখরিত।

সতেরোই অক্টোবর তাঁরা ইয়াংসি-কিয়াং নদী বেয়ে ষ্টীমারে ইচাঙের দিকে যাত্রা করলেন। ষ্টীমারের ডেক থেকে তাঁরা তাকিয়ে রইলেন সেই পরিত্যক্ত রাজধানী হ্যাঙ্কাউয়ের দিকে। এই হ্যাঙ্কাউয়ে তাঁরা যুদ্ধকালীন চীনের অবস্থা ও তার চিন্তাধারার সঙ্গে ভাল ক'রে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানেই তাঁরা চীনের দুর্দ্ধর্ষ





উপরে: অষ্টম পথ বাহিনীর পোশাকে ডা: কোটনিস ও ডা: বসু—পশ্চিম শানসি রণাঙ্গনে যাবার জন্য তারা প্রস্তুত হয়েছেন।

মাঝে—পশ্চিম শানসি অঞ্চলের গেরিলা সেনাদলের অধিনায়ক জেনারেল চেনের সঙ্গে ডা: বসু ও ডা: কোটনিস।

নীচে কাণ্টনে ডা: সান ইয়াৎ-সেন মেমোরিয়াল হলের সিঁড়িতে ভারতীয় কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের সদস্যগণ।







উপরে—চুংকিঙে অষ্টম পন্থা বাহিনীর কার্যালয়ে পণ্ডিত জওহরলাল।

নীচে—অষ্টম পন্থা বাহিনীর শহীদদের উদ্দেশে স্মৃতি-সভা।

উপরে—মাও-সে-তুং।

নীচে—ইয়েনানে একটি জনসভায় জেনারেল চু-তে'।





কম্যুনিস্টদের এবং তাদের বিখ্যাত "অষ্টম পন্থা বাহিনীর" (Eighth Route Army) সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা চোউ এন্-লাই, কুওমিন্টাঙ্গের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বামপন্থী রাষ্ট্রকর্মী, কোরীয়ান বিপ্লবীদল এমন কি ফ্যাসি-বিরোধী জাপানীদের সঙ্গে পর্যন্ত তাঁদের পরিচয় হয়েছিল এই হ্যাঙ্কাউয়ে। এই সব সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের জন্যই হ্যাঙ্কাউ তাঁদের কাছে স্মরণীয়হয়ে রইল।

এই সব ঘটনার বর্ণনা করতে হ'লে আমাদের একটু পেছিয়ে যেতে হবে।



"স্বাধীন ভারতের উদ্দেশ্যে"

"মানহুস গুলামী কো বঢ়্ কর্ হর্ মঞ্জিল্ পর্ ঠুক্‌রায়েঙ্গে,
ইন্‌সানী আজাদীকে লিয়ে জ্বল্ যায়েঙ্গে, কট্ যায়েঙ্গে,
ফির চীনী-হিন্দী মিল জুল্ কর্ নস্‌রৎকে তরাণে গায়েঙ্গে,
আজাদী-এ-আলম্ কা পরচাম্ ফির্ দুনিয়া পর্ লেহ্‌রায়েঙ্গে !"

(পদে পদে এই ঘৃণিত দাসত্বকে আঘাত ক'রে আমরা এগিয়ে যাব। মানুষের মুক্তির জন্য আমরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ব, আত্মবলি দেব। চীন-ভারতের মিলিত কণ্ঠে আমরা গাইব বিজয়-সঙ্গীত। ঊর্দ্ধে ওড়াব বিশ্বের মুক্তি-পতাকা।)

—সাগর নিজামী।

"বন্ধুগন! ভারতীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আমরা 'স্বাস্থ্যপান' করছি।" এই কথা দিয়ে ভারতীয় মেডিকাল মিশনের সম্মানে প্রদত্ত একটি প্রীতিভোজ সুরু হ'ল। চীনে ভোজের আগে 'স্বাস্থ্যপান' করবার প্রথা আছে, ভোজের পরে নয়। সে রাত্রে প্রথমেই ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে 'স্বাস্থ্যপান' করা হ'ল।

মিশন হ্যাঙ্কাউয়ে পৌঁছাবার তিনদিন পরে "অষ্টম পন্থা বাহিনীর"* কার্যালয়ে এই প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী, কম্যুনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতা, কম্যুনিস্ট-

* গোড়ায় এর নাম ছিল চীনা 'লাল ফৌজ'। কম্যুনিস্ট-কুওমিনটাঙ্গ মিলনের পর এই বাহিনী চীনের জাতীয় সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন এর নাম হয় "অষ্টম পন্থা বাহিনী" (Eighth Route Army)

দের মুখপত্র 'সিন্ হুআ জিহ্ বাও' (নবীন চীনা দৈনিক) এর সম্পাদক, একজন রুশ সাংবাদিক, একজন মার্কিন মহিলা* এবং একজন নাৎসি-বিরোধী জার্মান মহিলা।

ভারতের স্বাধীনতা, চীনের মিলিত সেনাবাহিনী, অষ্টম পন্থা বাহিনী, সোভিয়েট য়ুনিয়ন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে 'স্বাস্থ্য-পান' ক'রে ভোজ সুরু হ'ল। ভোজের শেষে সুরু হ'ল গানের পালা। নানা রকমের গান গাওয়া হ'ল—অষ্টম পন্থা বাহিনীর গান; "চিলাই"; পীতনদীর গান; রুশ বিমান-বহরের গান; "লা মার্সাই"; বৃটিশ মজুরদের গান; "বন্দে-মাতরম্" এবং কাজী নজরুল ইস্লামের বাংলা বিপ্লব-সঙ্গীত "চল্‌রে চল্‌রে চল্"। চীনের কম্যুনিস্টরা গানের খুব পক্ষপাতী; তাদের উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে ভারতীয় ডাক্তারদের সমস্ত সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রবীণ ডাঃ চোলকারও সাগ্রহে গানের সুরে নিজের গলা মেলালেন। হ্যাঙ্কাউয়ের সেই কাঠের বাড়ীটি বিভিন্ন সুরে, মিলিত কণ্ঠে গীত ছ'টি বিভিন্ন ভাষার স্বাধীনতা-সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠল।

গানের পর সুরু হ'ল বক্তৃতা। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচার বিভাগের নেতা, খর্বকায়, উজ্জ্বলদৃষ্টি কাই ফেং চীনা-ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক প্রচার-বিভাগের নেতা ওআঙ্ বিঙ্নান্ সেই বক্তৃতার জার্মান অনুবাদ করলেন; খ্যাতনাম্নী বিপ্লবী লেখিকা য়্যাগ্নেস্ স্মেড্‌লী

*ইনি খ্যাতনাম্নী বিপ্লবপন্থী লেখিকা য়্যাগ্নেস স্মেড্‌লী। —অনুবাদক।

আবার তার ইংরাজি অনুবাদ ক'রে দিলেন। প্রশংসাধ্বনির মধ্যে কাই ফেং বললেন, "সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে চীন শুধু নিজের জন্য লড়ছে না। চীনের এই সংগ্রাম বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত জাতির জন্য। এই মেডিকাল মিশন পাঠিয়ে চীনের প্রতি ভারতবর্ষ যে-সহানুভূতি দেখিয়েছে, তা আমরা কখনও ভুলতে পারব না। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যখন আমাদের সাহায্য প্রয়োজন হবে, তখন আমরা এই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করব।"

অষ্টম পন্থা বাহিনীর প্রধান কর্মাধ্যক্ষ এবং কম্যুনিস্ট চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক জেনারেল ইয়ে চিয়েন-ইং এই ভোজসভার সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি স্বাস্থ্যবান্, সদা-হাস্যময় সুপুরুষ ; বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। তিনিও বক্তৃতা দিলেন। অষ্টম পন্থা বাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতীয় মেডিকাল মিশনকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে তিনি কংগ্রেস ও কংগ্রেস-নেতাদের প্রতি চীনের কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলেন। চীনের জনগণের মিলিত প্রতিরোধশক্তি কেমন ক'রে বছরের পর বছর জাপানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, সে কথাও তিনি উল্লেখ করলেন।

ডাঃ অটল যখন এই সব বক্তৃতার জবাব দিতে উঠলেন, তখন তাঁকে হিন্দীতে বলতে অনুরোধ করা হ'ল। ডাঃ চোলকার তাঁর সেই হিন্দী বক্তৃতার ইংরাজি অনুবাদ করলেন, তারপর উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে একজন আবার সেই

বক্তৃতা চীনা ভাষায় অনুবাদ ক'রে দিলেন।

হ্যাঙ্কাউয়ে থাকবার সময় অষ্টম পন্থা বাহিনীর কার্যালয়ে চীনা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ তাঁদের আরও কয়েকবার হয়েছিল। এই অদম্য কম্যুনিস্টরা দশবৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র দমন-নীতি সত্ত্বেও টিঁকে ছিল। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ অভিযানে হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এরা উত্তর-পশ্চিম চীনের শেন্-সিতে নিজেদের রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল; জাপানের বিরুদ্ধে চীনের মিলিত যুদ্ধোদ্যোগে এরাই প্রধান শক্তি। ভারতবর্ষে থাকতেই এদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে এবং জাহাজে আসবার সময় এড্গার স্নোর "রেড্স্টার ওভার চায়না" পড়ে ভারতীয় ডাক্তাররা এদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুব উৎসুক ছিলেন। কম্যুনিজ্ম সম্বন্ধে তাঁরা বিভিন্ন মত পোষণ করতেন; কিন্তু চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তাদের অষ্টম পন্থা বাহিনী সম্বন্ধে তাঁরা সকলেই সমান আগ্রহান্বিত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যে অসামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং শত্রুর প্রতি যে অনমনীয় প্রতিরোধের ফলে এই বাহিনীর বীরত্ব প্রবাদে পরিণত হয়েছে, তার প্রতি তাঁদের অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এই বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে পাবার সম্ভাবনার কথা তাঁরা নিজেদের মধ্যে আগ্রহসহকারে আলোচনা করতেন।

যে প্রীতিভোজের কথা বলা হ'ল, তার পর একদিন তাঁরা একটি সাদাসিধে 'আট সেণ্টের' ভোজে নিমন্ত্রিত হ'লেন।

এ ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী এবং সাধারণ সৈন্য সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছিল। এই সৈন্যদের বেশ স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান ব'লে বোধ হচ্ছিল। এদের অধিকাংশই সাদাসিধে, কৃষক শ্রেণীর লোক। সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ যে, তার বয়স পনেরো বছরও পোরে নি। ভোজের ব্যবস্থা সাদাসিধে হ'লেও বেশ ভালই ছিল। খাবার পর যথারীতি অনেক গান ও বক্তৃতা হ'ল।

হ্যাঙ্কাউয়ে তাঁরা যে-সব কম্যুনিস্ট নেতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জেনারেল চোউ এন্-লাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন প্রবীণ বিপ্লবী নেতা এবং চীনের তিনজন প্রধান কম্যুনিস্ট নেতার মধ্যে একজন। এক সময় চীনের কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ধ'রে দেবার জন্য আশী হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল—আর আজ তিনি সেই কেন্দ্রীয় সরকারেরই রাজনৈতিক গণ-সংগঠন বিভাগের সহকারী কর্মাধ্যক্ষ। তা ছাড়া চীনের মিলিত যুদ্ধোদ্যোগ যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, এ জন্য তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি এবং কুওমিনটাঙ্গের মধ্যে সংযোগ-রক্ষার কাজও করেন। মিশনের সভ্যরা এড্গার স্নোর "রেড্স্টার ওভার চায়না" বইয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা পড়েছিলেন। সেখানে তাঁর এইরকম বর্ণনা করা হয়েছে ঃ—

"তিনি কৃশকায়, মাঝামাঝি ধরণের লম্বা ; শরীরের গড়ন তাঁর বেশ হাল্কা। লম্বা কালো দাড়ি এবং বড় বড় উজ্জ্বল ও

গভীর চোখ দু'টি সত্ত্বেও তাকে অনেকটা ছেলেমানুষের মত দেখায়। তিনি একটু লাজুক ; অথচ লোককে মুগ্ধ করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি লোককে চালিত করতে পারেন—এই সমস্ত গুণই তাঁকে একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি দিয়েছে।......তাঁর মত লোক চীনে খুব কমই আছে। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র ; কর্মশক্তির সঙ্গে জ্ঞান ও নিষ্ঠার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর মধ্যে। তাঁকে দেখেই বোঝা যায়, একজন বুদ্ধিজীবি মনীষি বিপ্লব-পন্থা অবলম্বন করেছেন।"

ভারতীয় ডাক্তারদের একজন তাঁর ডায়েরীতে জেনারেল চোউ এন্-লাই সম্বন্ধে লিখেছেন ; "তিনি সর্বদা উৎসাহে চঞ্চল ; চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ স্পষ্ট, চোখ দু'টি প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। তাঁর ভ্রূ যেমন ঘন, চীনে সচরাচর তেমন দেখা যায় না।" মার্কিন-সুলভ একটা ব্যস্ততার ভাব আছে তাঁর চারিদিকে অহরহ টেলিফোন বাজছে, মুহূর্তে মুহূর্তে দরকারী চিঠি ও টেলিগ্রাম আসছে, চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে অজস্র বই, ফাইল, ম্যাপ ইত্যাদি। মাটির কুটিরে অবস্থিত, সাদাসিধে আসবাবযুক্ত তাঁর যে খাসদপ্তরের বর্ণনা এড্গার স্নো ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে দিয়েছেন, তার সঙ্গে এর কত তফাৎ! তাঁর পরণে আগের মতই সাধারণ সৈনিকের পোষাক ; কিন্তু বেশ একটা নেতৃত্ব এবং কর্মতৎপরতার ভাব দেখা যাচ্ছিল তাঁর মধ্যে। টেলি-

ফোনে কথা বলা এবং সহকারীদের নির্দেশ দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাংবাদিকদের কাছে যুদ্ধ পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করছিলেন। কথা বলছিলেন তিনি চীনাভাষাতেই, কিন্তু ইংরাজিতে তাঁর বেশ দখল আছে। ইংরেজ এবং মার্কিন সাংবাদিকদের কাছে তাঁর কথার অনুবাদ করতে যেয়ে তাঁর দোভাষী যখন একটি গুরুতর ভুল ক'রে ফেলল, তিনি তখনই সেই ভুল শুধরিয়ে দিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতেই তিনি ভারতীয় ডাক্তারদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। মিশনের কাজ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। তাঁরা অষ্টম পন্থা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে চান শুনে তিনি খুব আনন্দের সাথে বললেন যে এ বিষয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং তাঁদের যথাসাধ্য সুযোগ-সুবিধা ক'রে দেবেন।

জেনারেল চোউকে তাঁদের খুবই ভাল লাগল। এর পরেও দু'একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন। হ্যাঙ্কাউয়ে তাঁদের সম্মানে প্রদত্ত একটি প্রীতিভোজের পর তাঁরা দেখেন যে সকলেই অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে বেশ একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন—শুধু জেনারেল চোউ সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ও স্থিরমস্তিষ্ক।

হ্যাঙ্কাউয়ে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য এবং অদ্ভুত লোকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। চীন সরকারের "নিয়ন্ত্রণ বিভাগের" প্রেসিডেণ্ট য়ু. য়ু. রেন্ এঁদের মধ্যে একজন; লম্বা হাল্কা

দাড়িতে এঁকে দেখায় অনেকটা কনফ্যুসিয়াসের মত; ভদ্রতা এবং বিনয়ের ইনি অবতার। ইংরেজ মহিলা-সাংবাদিক ফ্রেডা উট্‌লের সঙ্গেও তাঁদের এখানে পরিচয় হয়। হংকংয়ের সুবেশা ও চট্‌পটে শার্লট্ হ্যাডনের সঙ্গে এই সবলকায়া স্বাস্থ্যবতী মহিলার অনেক পার্থক্য। ইনি "জাপান'স্ ফীট অফ্ ক্লে" নামক বিখ্যাত পুস্তক লিখেছেন। জাপানের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এ বই অনেক দিন আগেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। অনেক দিন যাবৎ কম্যুনিস্টদের ওপর ইনি সহানুভূতি পোষণ করেছেন; কিন্তু পরে আদর্শের দিক দিয়ে 'কমিণ্টার্নের' সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। হ্যাঙ্কাউয়ে আসবার সময় তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে চীনা কম্যুনিস্টরা হয়ত তাঁকে মোটেই আমল দেবে না, কারণ মস্কো থেকে তাঁকে 'দলভ্রষ্টা' ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এ আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হ'ল—চীনা কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে বন্ধুর মত ব্যবহারই তিনি পেলেন। তারা তাঁকে সব সময় দরকারী সব খবর জানিয়েছে, ভারতীয় মিশনের সম্মানে অনুষ্ঠিত প্রীতিভোজ ইত্যাদিতে তাঁকে আমন্ত্রণ করেছে, এমন কি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য একটি চায়ের আসরেরও ব্যবস্থা করেছে।

এ ছাড়া তিনজন কোরীয়ান বিপ্লবী এবং অষ্টম পন্থা বাহিনীর একজন ফ্যাসি-বিরোধী জাপানী সাহিত্যিকের সঙ্গেও তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। এদের সঙ্গে তাঁরা আলাপ

করেন একদল দোভাষীর সাহায্যে। জাপানী থেকে কোরীয়ান, কোরীয়ান থেকে চীনা, চীনা থেকে জার্মান এবং জার্মান থেকে ইংরাজি—এমনি ক'রে অনুবাদের মধ্য দিয়ে চলল তাঁদের কথাবার্তা। আদর্শের ঐক্য কেমন ক'রে দেশ ও জাতির সীমাকে লঙ্ঘন করে, তা দেখে অবাক হ'তে হয়। চীনে যে সব জাপানী সৈন্য আছে, তাদের কাছে প্রগতি-পন্থী প্রচার-সাহিত্য পাঠাবার কাজে জাপানী লেখকটি নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রচারের উদ্দেশ্য জাপানী সৈন্যদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী রণনীতির বিরোধিতা সৃষ্টি করা। লেখকটি চীনাদের সঙ্গে বাস করতেন; তারাও তাঁর সঙ্গে সহকর্মীর মতই ব্যবহার করত। তা ছাড়া মিসেস্ য়্যানা ওআঙের সঙ্গেও ডাক্তারদের পরিচয় হ'ল। ইনি জাতিতে জার্মান (হিটলারের "আর্য"!)। একজন চীনা কম্যুনিস্টকে বিয়ে ক'রে ইনি চীনেরই বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। জাপানীদের বোমার হাত থেকে একাধিকবার ইনি অতি অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। জাপানীদের ওপর এঁর যেমন রাগ, তেমনি রাগ হিটলারের ওপর।

হ্যাঙ্কাউয়েই ভারতীয় ডাক্তাররা প্রথম একজন সোভিয়েট নাগরিকের সঙ্গে পরিচিত হন। ইনি 'টাস্' সংবাদ প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কর্মাধ্যক্ষ মঃ রাগফ্। ভদ্রলোক বেশ অমায়িক এবং হাসিখুসি। ভারতীয় ডাক্তারদের সম্বন্ধে ইনি মস্কোর সংবাদপত্রসমূহে বিস্তারিত খবর পাঠান।

হ্যাঙ্কাউয়ে যে ক'জন ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তারা সবাই শিখ। স্থানীয় ইংরেজ কর্মচারী ও বণিকদের অধীনে এরা কাজ করে। এদের প্রায় সবাই নিরক্ষর এবং খুব সাদাসিধে ধরণের লোক। কিন্তু অতিথি-বাৎসল্য এদের খুব বেশী। স্বদেশী ডাক্তারদের দেখে এরা খুব আনন্দিত হ'ল। এদের আমন্ত্রণে তাঁরা এদের গুরুদ্বারে গেলেন। ডাঃ অটল সেখানে হিন্দীতে একটি বক্তৃতা দিলেন। এরা দীর্ঘকাল যাবৎ চীনে আছে; কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে চীনের এই যুদ্ধের তাৎপর্য্য কি, তা বোধ হয় এরা এই প্রথম শুনল।

হ্যাঙ্কাউয়ে যত লোকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল, তার মধ্যে য়্যাগ্নেস্ স্মেড্লীর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় মিশন হ্যাঙ্কাউয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে এই মার্কিন মহিলা সবার আগে তাঁদের অভিনন্দন জানাতে এলেন। তাঁর গায়ে একটি চামড়ার কোট, মাথার পাকা চুলগুলি ছোট ক'রে ছাঁটা, চেহারায় জীবনব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের ছাপ। যতদিন তাঁরা হ্যাঙ্কাউয়ে ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁদের বে-সরকারী আশ্রয়দাত্রীর মতই ছিলেন— মায়ের মত স্নেহে তিনি তাঁদের সব অভাব মেটাবার চেষ্টা করতেন।

য়্যাগ্নেস্ স্মেড্লীর রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী নিয়ে বড় বড় কয়েক খণ্ড বই লেখা চলে। মার্কিন শ্রমজীবি পরিবারে তাঁর জন্ম। ন্যায়-সঙ্গত সমাজবিধান এবং গণবিপ্লবের

জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। স্বদেশ ত্যাগ ক'রে তিনি প্রথমে বাস করেছেন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও রাশিয়ায়; এখন আছেন কম্যুনিস্ট চীনে *।

ভারতীয় চিকিৎসকরা আগে থেকেই য়্যাগ্নেস্ স্মেড্লীর সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল পোষণ করতেন, কারণ ভারতীয় বিপ্লব এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে তিনি আজীবন জড়িত আছেন; তরুণ বয়সে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একজন ভারতীয় বক্তার বক্তৃতা শুনে অবধি তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ ক'রে আসছেন। পরে নিউইয়র্কে আরও অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সময় থেকেই তিনি অনমনীয় ভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে আসছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কারারুদ্ধ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের সহায়তা করেছিল। এর প্রতিবাদ করতে যেয়ে তিনি নিজেই কারারুদ্ধা হন; সেখানে

* আপ্টন্ সিন্‌ক্লেয়ার এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭): "খবরের কাগজে উত্তর-পশ্চিম চীনের সুদূর শেন্-সি প্রদেশ থেকে কতগুলি চমকপ্রদ খবর আসছে। মধ্য পশ্চিম আমেরিকার একজন শিক্ষয়িত্রী ঐ বিপদ্-সঙ্কুল এবং সংক্ষুব্ধ অঞ্চলে প্রগতিপন্থীদের অন্যতম নেত্রী হয়েছেন। তিনি সিআনফুতে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য চীনাদের একটি গণবাহিনী সংগঠন করেছেন। ... ... কেন তিনি অনশন এবং মৃত্যুকে অগ্রাহ্য ক'রে প্রথমে ভারতীয়, তারপর চীনা জনসাধারণের জন্য সংগ্রাম করছেন? কিসের জন্য তিনি তাদের সংগ্রামকে নিজের সংগ্রাম ক'রে নিয়েছেন? ... ... সুদূর পশ্চিম আমেরিকার এই শিক্ষয়িত্রী যদি জয়লাভ করেন, তাহ'লে লোকে তাঁকে তেমনি ক'রে স্মরণ করবে, যেমন ক'রে আমরা স্মরণ করি লাফায়েৎকে; যেমন ক'রে ফরাসীরা স্মরণ করে জোয়ান্ অফ্ আর্ককে।"

তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। যুদ্ধের পর মুক্তি পেয়ে তিনি ইংলণ্ডে যান, সেখান থেকে সোভিয়েট য়ুনিয়নে এবং পরিশেষে জার্মানিতে যান। জার্মানিতে একদল ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হন। চীনে তিনি এসেছিলেন সাংবাদিক রূপে, কিন্তু হিটলারের অভ্যুত্থানের খবর পেয়ে তিনি ঠিক করেন যে আর জার্মানিতে ফিরে যাবেন না। আমেরিকা এবং জার্মানিতে যে সব ভারতীয় বিপ্লবী আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী তিনি জানেন। এই মার্কিন মহিলা কখনও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেননি, কিন্তু ভারত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। একনিষ্ঠ সেবা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন।

এইজন্যই হ্যাঙ্কাউয়ে এত লোকের মধ্যে য়্যাগ্নেস্ স্মেড্‌লীই ভারতীয় ডাক্তারদের বিশিষ্টতমা বান্ধবী, সাহায্য-কারিণী এবং নেত্রী হতে পেরেছিলেন। এইজন্যই, অষ্টম পন্থা বাহিনীর কার্যালয়ে যখন স্বাধীন ভারতের উদ্দেশ্যে 'স্বাস্থ্য-পান' করা হয়, সেই সম্মান গ্রহণ করার জন্য ভারতীয় ডাক্তারদের সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধি রূপে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন য়্যাগ্নেস্ স্মেড্‌লী!



সঙ্কট-রজনী

"চীনকে সর্বতোভাবে পরাজিত করাই জাপানের একমাত্র কর্তব্য।"

—প্রিন্স কনোয়ে।

"যুদ্ধই সমস্ত সৃষ্টির উৎস এবং সভ্যতার প্রসূতি।"

—জাপানী সমর-বিভাগের ইস্তাহার।

ইভ্যাকুয়েশন!

হ্যাঙ্কাউ থেকে ইচাঙের পথে ডাক্তাররা দেখলেন, বেসামরিক অধিবাসীরা দলে দলে পালাচ্ছে নির্মম শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য। এই পলায়নপর জনতার মর্মন্তুদ দুরবস্থার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল। হ্যাঙ্কাউয়ের সেই আনন্দোচ্ছল দিনগুলি, সেই জনাকীর্ণ রাজপথ, প্রীতিভোজ, উৎসবের আড়ম্বর, জাতীয় অনুষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত আবেগ—এ সব যেন তাঁরা দূরে, বহুদূরে ফেলে এসেছেন। স্টীমার, লঞ্চ, ছোট-বড় নৌকো, এমন কি ভেলায় ক'রে পর্যন্ত সহরের অধিবাসীরা চলেছে উজান বেয়ে। সঙ্গে রয়েছে তাদের পোঁটলা-পুঁটলি, ক্রন্দনরত শিশু, ছাগল, মুরগী। বাস্তুভিটা ছেড়ে তারা চলে এসেছে। বিমর্ষ দৃষ্টিতে তারা সবাই তাকিয়ে ছিল অপস্রিয়মান হ্যাঙ্কাউয়ের দিকে। নদী বাঁক ঘুরতেই এ দৃশ্য মিলিয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। তারা হয়ত ভাবছিল, আর কখনও তাদের ফিরে আসা হবে কি-না। কিন্তু মুখে কারও কোন কথা নেই। অবিচলিত

চীনারা কাঁদতে জানে না।

ডাক্তাররা যে স্টীমারে ছিলেন, নদীবক্ষে অন্যান্য নৌকো-স্টীমারের মত তাতেও যাত্রীর ভিড় ছিল মাত্রাতিরিক্ত। প্রয়োজন অনুযায়ী জাহাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। একটি প্রধান কারণ এই যে, জাপানী নৌবহর যাতে হ্যাঙ্কাউয়ের উজানে না যেতে পারে, সেই জন্য বড় বড় কয়েকখানা জাহাজ ডুবিয়ে নদীবক্ষে চলাচলের পথকে সঙ্কীর্ণ করা হয়েছিল।

স্টীমারের ডেক থেকে ইয়াংসি-কিয়াংকে এলাহাবাদের গঙ্গার চেয়েও বেশী চওড়া দেখাচ্ছিল। নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর নীচু পাহাড়ের সারি, আর উত্তরে চীনের বিস্তীর্ণ সমভূমি যোজনের পর যোজন ধ'রে হরিৎ ক্ষেত্র, তার মাঝে মাঝে মাটির কুটির। ভারতীয় গ্রামের সঙ্গে এই সব চীনা বসতির বেশ সাদৃশ্য আছে। এই শ্যামল প্রান্তরের ওপর তখন পড়েছে যুদ্ধের কৃষ্ণচ্ছায়া—শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে পশ্চাদ্‌গামী সৈন্যের দল কুচ্‌-কাওয়াজ ক'রে চলেছে।

এই শোচনীয় দৃশ্যের দুঃখ খানিকটা লাঘব করতে সাহায্য করলেন জাহাজে তাঁদের নবলব্ধ বন্ধুরা। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ এবং "তরুণ শিক্ষক" আন্দোলনের প্রবর্তক অধ্যাপক তাও তাঁদের অন্যতম সহযাত্রী ছিলেন। ইনি রাজনৈতিক গণ-পরিষদের (চীনের পার্লামেণ্ট) অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য নূতন রাজধানী চুংকিঙে যাচ্ছিলেন। এই কেশবিহীন,

চশমধারী অধ্যাপক তাঁদের রোমান হরফের মারফৎ চীনাভাষা শিখাতে লাগলেন। এতে তাঁদের অনেকটা সময় বেশ ভালভাবে কাটল। জাহাজে গণ-পরিষদের আরও কয়েকজন নবনির্বাচিত সদস্য ছিলেন। চীনের নূতন গণতান্ত্রিক সংগঠন সম্বন্ধে এঁদের খুব আগ্রহশীল ব'লে বোধ হ'ল।

অধ্যাপক তাও'র "তরুণ শিক্ষক" আন্দোলন সম্পর্কে ডাক্তাররা খুব আগ্রহ দেখানতে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করলেন। এই "তরুণ শিক্ষক"রা সবাই দশ থেকে পনের বছর বয়সের ছাত্রছাত্রী। গ্রামে গ্রামে (এমন কি জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে পর্যন্ত) ঘুরে এরা বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কৃষকদের লিখতে পড়তে শেখায়, আর শেখায় জাপানের সঙ্গে চীনের এই যুদ্ধের মূল আদর্শ কি। জাহাজে দশবৎসর বয়স্ক একজন "তরুণ শিক্ষক" ছিল। ভারতীয় ডাক্তাররা এই জাহাজে আছেন শুনেই সে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এল। বালক-সুলভ আন্তরিকতা নিয়ে সে তাঁদের নূতন জাতীয় সঙ্গীত শেখাতে চাইল। এই ছেলেটির বুদ্ধিমত্তা, শোভন ব্যবহার এবং দেশপ্রেম দেখে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এই ছোট ছেলেটি যে সংগ্রাম করছিল, রণাঙ্গণে যুদ্ধরত সৈন্যদের সংগ্রামের চেয়ে তা কোন অংশে কম নয়। জাপানীদের বিপুল অস্ত্রশক্তি অনেক জায়গায় চীনের জাতীয় বাহিনীকে পরাজিত করেছে সত্য, কিন্তু এই "তরুণ শিক্ষকদল" এবং এঁদের মত অন্যান্য

অস্ত্রহীন যোদ্ধাদের নিয়ে চীন যে-বাহিনী গড়ে তুলেছে, তা অপরাজেয়! কারণ, আত্মিক শক্তির অস্ত্র দিয়ে এরা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

* * * *

শ্লথগতিতে চারদিন চলবার পর তাঁরা ইচাঙে পৌঁছালেন। সহরটি ছোট হ'লেও বন্দর হিসাবে এর গুরুত্ব আছে এখান থেকে ইয়াংসি নদী এত সরু হয়ে গেছে যে বড় বড় জাহাজ এই বন্দর ছাড়িয়ে আর উজানে যেতে পারে না। শুধু ছোট ছোট নৌকোই এই সংকীর্ণ খরস্রোতে উজিয়ে যেতে পারে। ইচাঙেও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এবং বণিকতন্ত্রের চিহ্ন দেখা গেল। স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর কারখানা, বৃটিশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, পাদ্রীর দল—সবই এখানে আছে, এমন কি য়ুনিয়ন জ্যাক ওড়ানো গোলন্দাজ নৌকো পর্যন্ত।

বাইশে অক্টোবর থেকে ষোলই নবেম্বর, এই ছাব্বিশ দিন ডাক্তাররা ইচাঙে ছিলেন। এখানে তাঁরা ১নং সামরিক শিবির-হাসপাতাল এবং ৮৬নং রেড্‌ক্রশ হাসপাতালে কাজ করেছেন। হ্যাঙ্কাউ থেকে আহত সৈনিকদের এখানে পাঠানো হ'ত। এই দীর্ঘ যাত্রাপথেই অনেকের মৃত্যু ঘটত। পথে আহত-সৈন্য-বাহী কয়েকখানা জাহাজের ওপর জাপানীরা বোমা ফেলেছিল। এই ধরনের আক্রমণের পর একবার যখন আহত সৈন্যরা জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল, সেই সময় জাপানীরা তাদের ওপর আবার বোমা ফেলে এবং

মেশিন্‌গান চালায়। এই রকম শোচনীয় খবর আরও পাওয়া গেল। একটি খবরে জানা গেল, অষ্টম পন্থা বাহিনীর সৈন্যদের নিয়ে হ্যাঙ্কাউ থেকে আসবার পথে একখানা জাহাজ জাপানী বোমার আঘাতে ডুবে গেছে। যাত্রীদের মধ্যে চল্লিশ জনের সেখানেই মৃত্যু হয়; বাকি যারা ছিল, তারা অন্য পথে চ্যাংশায় চলে যায়। ডাক্তাররা ইচাঙে পৌঁছেই খবর পেলেন যে জাপানীরা ক্যাণ্টনে প্রবেশ করেছে এবং হ্যাঙ্কাউয়ের ওপর সেদিন চারবার বিমান-হানা হয়েছে। তাঁরা শুনলেন যে হ্যাঙ্কাউ শীগ্‌গিরই জাপানীদের হস্তগত হবে। জাপানীরা ক্রমেই যে-ভাবে এগিয়ে আসছিল, তাতে আশঙ্কা হচ্ছিল যে ইচাঙ্‌ও হয়ত শীগ্‌গিরই ছেড়ে দিতে হবে।

উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং নানারকম গুজবের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন কাটতে লাগল। প্রত্যেক সপ্তাহেই তাঁদের আশঙ্কা হতে লাগল, এইবার বুঝি অন্যত্র যাবার আদেশ আসে। ক্রমেই শীত বাড়তে লাগল; রীতিমত কুয়াসা ও বৃষ্টি সুরু হল। অষ্টম পন্থা বাহিনীর সঙ্গে আরও উত্তর-পশ্চিমে, সিয়াঙ্ অঞ্চলে, গেলে কি-রকম আবহাওয়ার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হবে, তার খানিকটা নমুনা তাঁরা এখানেই পেলেন। কিন্তু তাঁদের সুযোগ্য নেতা ডাঃ অটল সেই দারুণ শীতও অগ্রাহ্য করতে তাঁদের শেখালেন। আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের শরীরকে মানিয়ে নেবার জন্য তাঁরা রোজ বিকেল

চারটে থেকে সন্ধ্যা আটটা অবধি রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন এবং পাহাড়ে চড়বার অভ্যাস করতেন। একদিন মুষলধারে বৃষ্টি ও কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে দশমাইল পথ হেঁটে তাঁরা ইচাঙের বিখ্যাত পার্বত্য-নদীর উৎস দেখতে গেলেন। জলে ভিজে, খুব ক্লান্তদেহেই তাঁরা ফিরলেন; কিন্তু এই সফল অভিযানের জন্য আনন্দও তাঁদের কম হয় নি।

নবেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই ইচাঙ্ জাপানীদের বোমারু বিমানের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল। প্রকৃতি-দেবীও যেন শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে বসলেন। রাতের আকাশে কুয়াসার আভাসমাত্র নেই—চারিদিক জ্যোৎস্নায় ধব্ ধব্ করছে। তেসরা নবেম্বর জাপসম্রাটের জন্মদিন পালন করবার জন্যেই বোধ হয় জাপানী বিমান-বহর একযোগে চীনের অনেকগুলি সহরের ওপর হানা দিল—কিন্তু ইচাঙে সেদিন বোমা পড়ে নি। পরদিন জাপানীদের একখানা পর্যবেক্ষক বিমান সহরের ওপর দিয়ে চলে গেল। তারপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ন'খানা জাপবিমান ইচাঙের ওপর হানা দিল। ডাক্তাররা তখন হাসপাতালে ছিলেন; সতর্ক-ধ্বনি শুনেই তাঁরা রোগীদের নিয়ে মাটির নীচে আশ্রয়-কক্ষে আশ্রয় নিলেন। বোমা পড়বার তীক্ষ্ণ, তীব্র আর্তনাদের মত ধ্বনি, ভারী গোলা পড়বার শব্দ, বিমান-বিধ্বংসী কামানের অবিরাম গর্জন—এসব তাঁরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। সুখের কথা, সেদিন কেউ হতাহত হয়নি,

কারণ অধিকাংশ বোমাই সহরের উপকণ্ঠে পড়েছিল। বিমান ঘাঁটির কাছে বোমা পড়বার ফলে বড় বড় গর্ত হয়েছিল: তা দেখে মনে হ'ল বিমান ঘাঁটিটিই ছিল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। সাতই নবেম্বর পূর্ণিমা রাতে আবার একঝাঁক বোমারু বিমান ইচাঙের ওপর হানা দিল। আগের বার বিশেষ কোন ক্ষতি না করতে পেরেই বোধ হয় জাপানী বৈমানিকরা খুব উগ্র হয়ে ছিল, তাই এবার তারা কোন অনিশ্চিত সম্ভাবনার মধ্যে না যেয়ে খুব নীচু থেকে বিমান-ঘাঁটির ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ফেলতে লাগল। এই আক্রমণে অনেক লোক হতাহত হ'ল; কয়েকটি বসত-বাড়ীর ওপরও বোমা পড়েছিল। দুঃখ এই যে চাঁদের ওপর নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা জারী করা চলে না।

হ্যাঙ্কাউয়ের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আগেই বন্ধ হয়েছিল। তার ওপর জাপানী বিমান-বহরের এই ঘনঘন আক্রমণে ইচাঙের অধিবাসীরা খুব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। দলে দলে লোক চুংকিঙের দিকে পালাতে লাগল; জন কয়েক পরাজয়ী-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক আবার এর মধ্যে গুজব রটাতে লাগল যে চীনের সামরিক শক্তি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই গুজবের গতি রোধ করবার জন্য কর্তৃপক্ষ মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি-সম্বলিত অনেকগুলি প্রচার-পত্র এরোপ্লেন থেকে সহরের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। সামরিক পরাজয় সত্ত্বেও চীনা-

বাহিনী যে জাপানের বিরুদ্ধে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং চীনের সরকার ও জনসাধারণ যে চরম বিজয়ে আস্থাশীল, এই ছিল সেই বিবৃতির সারমর্ম। বিবৃতির ফলে গুজবের প্রসার বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই ইচাঙ্ ত্যাগের ব্যবস্থাও চলতে লাগল। চুংকিঙে যাবার আদেশ পেয়ে ভারতীয় ডাক্তাররা স্টীমারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আশ্চর্যের কথা এই যে পুনঃপুনঃ বিমান আক্রমণে লোকের মনোবল কমে না, বরং বেড়েই যায়। প্রথম দু'একবার বিমান-হানার সময় সবারই বেশ ভয় হয়, তারপর তাদের স্নায়ুতন্ত্র ঐ আকস্মিক আঘাত সয়ে নিতে শেখে। ইচাঙে থাকবার সময় ভারতীয় ডাক্তাররা বিমান-হানার ভয়কে এতদূর জয় করেছিলেন যে শেষটা তাঁরা সতর্কধ্বনি শুনেও আশ্রয়-কক্ষে যাবার কষ্ট স্বীকার করতে চাইতেন না। একদিন যখন ইচাঙ্ বিমান-ঘাঁটির কাছে বোমা পড়ছিল, তাঁরা তখন বেশ প্রফুল্লচিত্তে রেডিওর গান শুনছিলেন। কয়েকদিনের চেষ্টার পর তাঁরা সবে শর্টওয়েভে কলকাতা বেতারকেন্দ্র ধরতে পেরেছিলেন। জাপানী বোমার বিভীষিকাকেও হার মানিয়ে দিল ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি তাঁদের অনুরাগ!

ভারতবর্ষ থেকে যে সব ওষুধের বাক্স তাঁদের সঙ্গে এসেছিল, সেগুলি খোলবার সময় একটি মজার ঘটনা ঘটে।

একটি বাক্সের চেহারা ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের। সেটি খুলে দেখা গেল, তার মধ্যে ওষুধপত্রের বদলে রয়েছে— একটি গ্রামোফোন। নিতান্ত আশ্চর্য হয়ে তাঁরা গ্রামোফোনটি বার করলেন। তার সঙ্গে বেরোল একটুকরো সই করা কাগজ। সইটি খুবই পরিচিত। গ্রামোফোনটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপহার— তিনি এটা তাঁদের জন্য বিশেষ ভাবে ইংলণ্ড থেকে পাঠিয়েছিলেন। ওষুধের বাক্সের সঙ্গে গ্রামোফোনের বাক্সটি মিশে ছিল বলেই তাঁরা আগে এটির কথা জানতে পারেন নি। যাই হোক, এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে তাঁরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। পণ্ডিতজীর বদান্যতা ও দূরদর্শিতা তাঁদের গভীর ভাবে অভিভূত করল। সেদিন তাঁরা সারারাত জেগে বারে বারে রেকর্ডগুলি বাজালেন।

ষোলই নবেম্বর একখানা লঞ্চে করে তাঁরা চুংকিঙে রওনা হ'লেন। তাঁদের সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন চীন সরকারের দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং নরওয়ে থেকে আগত আটজন 'মিশনারি'। এই আটজনের মধ্যে ছ'জনই স্ত্রীলোক—এঁরা সুদূর নরওয়ে থেকে এসেছেন যাঁর যাঁর বাগদত্ত স্বামীকে বিবাহ ক'রে চীনে বসবাস করবার জন্য। যাত্রীদের মধ্যে একজন এদের নাম রাখলেন "নরওয়ের ছ'টি বধূ।" যুদ্ধ, বিমানহানা এবং ইভ্যাকুয়েশনের উদ্বেগ-অশান্তির মধ্যে এদের উপস্থিতি নূতন ক'রে সবাইকে মনে করিয়ে দিল যে প্রেম ও মাধুর্য মানুষের জীবন থেকে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি।

চুংকিঙে 'ঝঞ্ঝা'-আক্রমণ

"এই চীনাদের আমি বুঝে উঠতে পারিনে। এরা এমন একটি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, যা চালানো কোন অর্বাচীন জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। অপমান-জনক সর্তে শান্তি এরা চায় না। এরা যদি হেরে যায়, তাহ'লে যার জন্য এরা লড়ছে, তা সমূলে ধ্বংস হবে। সভ্যতা' বলতে আমরা যা বুঝি, তারই জন্য এরা লড়ছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যুদ্ধের মধ্যেও এরা ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে সচেতন।"

—ডি. এফ্. কারাকা (চুংকিং ডায়েরি)।

খরস্রোতা ইয়াংসিতে উজান বেয়ে অতি মন্থর গতিতে চলছে ছোট্ট স্টীমলঞ্চখানা। বেগ তার ঘণ্টায় দু'মাইলও হবে কি-না সন্দেহ। বজরা এবং দাঁড়ের নৌকোগুলিকে মাল্লারা গুণ টেনে নিয়ে চলেছে, যেমন ক'রে কাশ্মীরে 'হাউস বোট' চালানো হয়।

ইয়াংসি যতই উজানে গেছে, তার প্রসার ততই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে আর স্রোতের বেগ হয়েছে খরতর। দু'ধারে খাড়া পাহাড় অনেক উঁচুতে উঠে গেছে প্রকৃতির হাতে গড়া বিরাট দৈত্যের মত। এদের দিকে তাকালে মানুষের শোচনীয় ক্ষুদ্রতার কথা মনে না পড়ে পারে না।

একটা বাঁকের মুখে লঞ্চের বাশী তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ক'রে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই আওয়াজের অনেকগুলি অদ্ভুত প্রতিধ্বনি। এই জায়গাটাকে বলা হয় "বায়ুপ্রকোষ্ঠ" (Windbox) অধিত্যকা।

চীনাভাষায় সব জিনিষেরই এইরকম সুন্দর নাম আছে।

দ্বিতীয় দিন তাঁরা এইসব খাড়া পাহাড় এবং অধিত্যকা ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়ের সারির পাশ দিয়ে চলতে লাগলেন। এই অঞ্চলের নাম জেচুয়ান—কথায় কথায় অর্থ করলে এর মানে দাঁড়ায় "চার নদীর দেশ।" আয়তনে এই প্রদেশটি চীনের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার মত ঘন বসতি চীনের আর কোন প্রদেশে নেই। নদীর দু'ধারে ছোট ছোট সুন্দর গ্রাম ও সহর; পীচ্-ঢালা রাস্তা; বিজলি বাতি; কমলালেবুর বন; বাগান; টালির ছাউনি দেওয়া, চুণকাম করা সুন্দর সুন্দর কুটির। এসব দেখে মনে হয়, এই শান্ত, সুন্দর অঞ্চলে যুদ্ধ এখনও দেখা দেয়নি। কিন্তু এ ধারণা ভেঙ্গে যায় তখনই, যখন 'রেড্ ক্রশ' আঁকা নূতন সামরিক হাসপাতালগুলি নজরে পড়ে; যখন দেখা যায়, হ্যাঙ্কাউ ও ইচাঙ্ থেকে দলে দলে সৈন্য কুচ্-কাওয়াজ ক'রে আসছে।

যাত্রার তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে চোখে পড়ে আরও অনেক কমলালেবুর বন আর পাহাড়ের ঢালুতে শাক-সব্জীর ক্ষেত। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর "এরোপ্লেনের" আওয়াজ শোনা যায়, আর নদীবক্ষে দেখা যায় গোলন্দাজ নৌকো। অবশ্য এরোপ্লেন এবং নৌকোগুলি সবই চীনের। এই ছোট ছোট গোলন্দাজ নৌকোগুলি যখন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, স্টীমারের চীনা নাবিকরা হাত নেড়ে, চিৎকার

ক'রে, এদের উৎসাহ দিচ্ছিল।

ডাক্তারেরা যতই এগোতে লাগলেন, শীত এবং কুয়াসাও ততই বাড়তে লাগল। কমলালেবুর বদলে এবার পাহাড়ের গায়ে দেখা গেল পাইন গাছের বন। ঘন কুয়াসা ভেদ ক'রে তুষারশীতল স্রোতের মধ্য দিয়ে তাঁদের লঞ্চ এগিয়ে চলল। আবহাওয়ার কঠোরতা দেখেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে চুংকিঙের কাছাকাছি এসেছেন।

ইচাঙ্ থেকে বেরিয়ে ছ'দিনের দিন তাঁরা চুংকিঙে পৌঁছালেন। এঞ্জিনের শব্দ করতে করতে নানা রকম নৌকো-জাহাজের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে তাঁদের লঞ্চ দক্ষিণ তীরে নোঙ্গর ফেলল। মিশনকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন চুংকিঙের মেয়র ডাঃ মেই, মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের তরফ থেকে একজন সামরিক কর্মচারী, শান্তিনিকেতনের চীন-ভবনের অধ্যাপক তান ইয়েন শান, স্থানীয় বৌদ্ধসমিতির সভাপতি এবং কয়েকজন ক্যানাডিয়ান মিশনারি। এই মিশনারিদের আশ্রয়েই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। তাঁরা যে রকম অভ্যর্থনা পেলেন তা বাস্তবিকই গর্বের বিষয়। জেনেরালিসিমো চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধি তাঁদের জানালেন যে 'বৈদেশিক-অতিথি-ভবনে' তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই অতিথি-ভবনে থাকতে পাওয়াটা বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক, কারণ সাধারণতঃ বৈদেশিক রাজদূত এবং অতি উচ্চপদস্থ কূটনীতিবিশারদদের

জন্যই এ ভবন নির্দিষ্ট। ডাঃ অটল ধন্যবাদের সঙ্গে এই সম্মানজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন যে চুংকিঙে স্থানাভাবের কথা তাঁরা জানেন, তাই সরকারী অতিথিদের অযথা অসুবিধা ঘটাতে তাঁরা চান না।

সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরা সরকারী লঞ্চে ক'রে নদী পার হ'লেন। লঞ্চ থেকে নেমেই সামনে পড়ল বিরাট এক সিঁড়ি। পথশ্রম ভুলে তাঁরা বুক ফুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। চুংকিঙে এই তাঁদের প্রথম সিঁড়ি ভাঙা—কিন্তু এই শেষ নয়। যতদিন এখানে ছিলেন, বহু সিঁড়ি তাঁদের ভাঙতে হয়েছে।

হংকং এবং সমুদ্রতট থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে, জেচুয়ান পর্বতমালার মধ্যে ইংয়াসি ও কিয়ালিং নদীর সঙ্গমস্থলে এই চুংকিঙ্ সহর। লোকে বলে, গত চার হাজার বছর যাবৎ এখানে সহর রয়েছে। কিন্তু হ্যাঙ্কাউ ত্যাগ করবার আগে অনেকেই ভাবতে পারে নি যে দেশের সুদূর অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত এই অখ্যাতনামা পার্বত্য সহরটি একদিন চীনের রাজধানীরূপে পেকিং এবং নানকিংয়ের গৌরবের উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়াবে। যুদ্ধকালীন অবস্থার দরুণ চীনের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র ক্রমেই পশ্চিমের দিকে সরে আসছিল। শুধু যে রাজধানীই স্থানান্তরিত হচ্ছিল, তা নয়। সমরনীতির দিক দিয়ে অবশ্য এই পরিবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অধিকৃত-অঞ্চলের জাপ শিবিরগুলি থেকে

যতটা সম্ভব দূরে নিরাপদ স্থানে স'রে আসা। কিন্তু এই রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চীনের অবজ্ঞাত এবং অনগ্রসর অভ্যন্তরভাগে আসছিল নূতন প্রাণের স্পন্দন। বহু শতাব্দী ধরে পূর্বচীনের সমুদ্রতটে, উত্তরে পেকিং থেকে দক্ষিণে ক্যাণ্টন পর্যন্ত অঞ্চলে, শুধু যে রাষ্ট্রশক্তিই কেন্দ্রীভূত ছিল, তা নয়—শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিরও একমাত্র কেন্দ্র ছিল এই অঞ্চল। জাপানী আক্রমণের পর থেকে সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলের "উন্নত" অধিবাসীরা পশ্চিমে যেতে বাধ্য হয়েছে। খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের ছাত্র এবং গ্রন্থাগার সমেত দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গ্রামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বড় বড় অনেক রাষ্ট্রনেতা, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, শিল্পী, বণিক এবং শিল্পপতি এই প্রথম চীনের অভ্যন্তরভাগের শস্য-শ্যামল রূপ দেখলেন। কানসু, শান্‌সি, হুপে, হুনান্ ও জেচুয়ান্ প্রদেশের পর্বতে ও সমভূমিতে এমনি ক'রে জেগে উঠছে নূতন প্রাণ। মাতৃভূমির সঙ্গে চীনাদের এই নূতন পরিচয়ের প্রতীক মনে করা যেতে পারে চুংকিঙ্‌কে।

ডাক্তাররা চুংকিঙে এসে বেশ একটা তৎপরতা ও ব্যস্ততার ভাব দেখলেন। পূব থেকে ইভ্যাকুয়িরা এসেছে, সেই সঙ্গে এসেছে চীনসরকার ও কুওমিনটাঙ্গের কর্মচারীরা এবং তাদের পরিবার-পরিজন। ফলে চুংকিঙের লোকসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। আমেরিকান ধরণে অনেক লোকের থাকবার মত সস্তা বাড়ী চুংকিঙের সর্বত্র অতি দ্রুতবেগে

তৈরী হচ্ছে। রোমের মত চুংকিঙ্ সহরটি কতকগুলি পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে। সহরের মধ্যে চলাফেরা করতে গেলেই অনবরত অসংখ্য সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে করতে হয়। বড়লোক এবং সরকারী আমলারা অবশ্য 'সীডান-চেয়ারে' চলাফেরা করেন, কিন্তু সাধারণ লোকদের অনবরত সিঁড়ি ভাঙা ছাড়া উপায় নেই। সহরের সঙ্কীর্ণ রাজপথের দু'পাশে দোকানগুলি পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ, কিন্তু জিনিষপত্রের দাম খুব চড়া। হ্যাঙ্কাউয়ের মত চুংকিঙে সামরিক আবহাওয়া অতটা প্রবল নয়; তা হ'লেও এখানকার পথে-ঘাটে অনেক সৈনিক ও সামরিক কর্মচারীর দেখা মেলে—এরা প্রায় সবাই ছুটিতে আছে। সহরের দেওয়ালে দেওয়ালে যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানারকমের প্রচারপত্র আঁটা। চারদিকে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা এবং জাতীয় উত্তেজনার ভাব। জনসভা, রাজনৈতিক আলোচনা, মিছিল—এ সবের যেন আর বিরাম নেই। স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বামপন্থী প্রবণতা বেশ নজরে পড়ে। বইয়ের দোকানগুলিতেও এই প্রবণতার আভাস পাওয়া যায়—সেখানে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বই যথেষ্ট বিক্রী হচ্ছে।

* * * *

চুংকিঙে তাঁরা দু'মাস ছিলেন। এর মধ্যে স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং চীনসরকারের অনেক উচ্চপদস্থ

কর্মচারীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গেই তাঁদের দেখা হয় নি। এজন্য হু'পক্ষই খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। জাপানীদের দ্বারা হ্যাঙ্কাউ অধিকৃত হবার ফলে যে সব নূতন রক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাই নিয়েই চিয়াং কাই-শেক তখন বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি সময় ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই তাঁরা ইয়েনানে যাবার আদেশ পেলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করা হ'লনা ব'লে দুঃখ প্রকাশ ক'রে মার্শাল চিয়াং তাঁদের কাছে একটি বাণী পাঠান। এই বাণীতে তিনি অনুরোধ করেন যে তাঁর সঙ্গে দেখা করা হ'ল না এজন্য কিছু মনে না ক'রে তাঁরা যেন রেড্‌ক্রশের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের কর্তব্য-স্থানে যাত্রা করেন। চীনসরকারের যিনি সর্বময় কর্তা, তাঁর কাছে একজন আহত সৈনিকের পরিচর্যার মূল্য শিষ্টাচার-সঙ্গত আলাপ-পরিচয়ের চেয়ে অনেক বেশী!

যাই হোক, মাদাম চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন। 'নবজীবন আন্দোলনের' (New Life Movement)* উদ্যোগে বর্ষ-বিদায় উপলক্ষ্যে

* "নবজীবন-আন্দোলন" মুখ্যতঃ ওয়াই. এম. সি. এ-র আদর্শে পরিকল্পিত। আত্ম-নির্ভরশীলতা এবং প্রগতির গঠনমূলক কর্মপন্থা নিয়ে চীনের গৃহযুদ্ধের সময় এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কম্যুনিস্টদের প্রভাব হ্রাস করা। পল্লী-উন্নয়ন, বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান, বিশেষ ক'রে নিয়মানুবর্তিতা, শ্রমশীলতা, ভব্যতা প্রভৃতি

অনুষ্ঠিত এক সামাজিক প্রীতিসম্মিলনে তাঁরা মাদাম চিয়াংয়ের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি মেডিকাল মিশন পাঠাবার জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতি চীনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তাঁকে একটু ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন বোধ হচ্ছিল। দেশের জন্য তিনি সর্বদা যেমন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা করেন, তাতে ক্লান্তি ও উদ্বেগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবু নীলরঙের একটি সাদাসিধে চীনা গাউনে তাঁকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে স্মিতহাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ছিল বাহ্যিক আদব-কায়দার অভাব, আর একটা সুন্দর সাম্যের ভাব। এরই জন্য মাদাম চিয়াং চীনের আবাল-বৃদ্ধ সকলের এত প্রিয়।

এই অনুষ্ঠানে তাঁরা আর একজন অসাধারণ লোকের

শেখান, এ আন্দোলনের কাজ। চীনের সর্বত্র জনসভা ক'রে স্বাস্থ্য ও নীতিশাস্ত্রের সরল বিধানগুলি প্রচার করা হয়; যেমন, "যেখানে সেখানে থুথু ফেলো না—পরিচ্ছন্নতা রোগ নিবারণ করে;" "ভিড় কোরোনা, লাইন দিতে শেখ;" "মদ, গণিকা ও জুয়াখেলা ত্যাগ কর" ইত্যাদি। মাদাম চিয়াং কাই-শেকের মতে এই 'নবজীবন-আন্দোলন'ই কুওমিনটাঙ্গের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"

—জন গান্থার (ইন্‌সাইড্ এশিয়া)।

"মাদাম চিয়াং সর্বদাই এ কথার ওপর জোর দেন যে খুঁটিনাটি—যেমন, পোষাক পরিচ্ছদে শালীনতা এবং মিতব্যয়িতা, পরিচ্ছন্নতা, খাবার সময় রুচিসঙ্গত ব্যবহার, সিগারেট খাওয়া কমানো—এইগুলিই সেই আধ্যাত্মিক উন্নতির বাহ্যিক লক্ষণ, যার জন্য মার্শাল চিয়াং কাই-শেক চেষ্টা করছেন।

—এমিলি হ্যান্ (দি সুঙ্ সিষ্টারস্)।

সঙ্গে পরিচিত হ'লেন। ইনি ডোনাল্ড নামে একজন ষাট বৎসর বয়স্ক, পক্ককেশ অস্ট্রেলিয়ান। অনেক বড় বড় নেতার বন্ধু ও পরামর্শদাতা রূপে ইনি চীনের বিপ্লবের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে ইনি প্রথম চীনে আসেন। তারপর বিপ্লবের সময় বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইনি মাঞ্চু-বংশের পতন ঘটাতে সাহায্য করেন। সেই থেকে ইনি চীনেই রয়ে গেছেন। ইনি মাদাম চিয়াং-য়ের পিতার এবং ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এখন ইনি চিয়াং-দম্পতির বে-সরকারী পরামর্শদাতা এবং অবিচ্ছেদ্য সহচর।

চুংকিঙে এসেই যে সমস্ত গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল, তার মধ্যে চীন গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট লিন্ সেন অন্যতম। প্রফেসার তান ইয়েন শানের সঙ্গে তাঁরা জাতীয় সরকারের কেন্দ্রীয় দপ্তরে গেলেন -সহর থেকে পাঁচমাইল দূরে সাদাসিধে ধরণের একটি বাড়ীতে এই দপ্তর অবস্থিত। একজন সামরিক কর্মচারী তাঁদের 'অভ্যর্থনা-কক্ষে' নিয়ে গেলেন। খানকয়েক চেয়ার ছাড়া সে ঘরে আর কোন আসবাবপত্র বা সাজসজ্জা ছিল না। এর সঙ্গে নয়াদিল্লীতে লাট-প্রাসাদের বিলাসিতা এবং জাঁকজমকের তুলনা ক'রে ডাক্তাররা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। প্রেসিডেণ্ট লিন্ সেন এলেন একটু দেরীতে। তাঁর মনোজ্ঞ ব্যবহার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব সহজেই

তাঁদের মুগ্ধ করল। চীনের সুচিরাগত সংস্কৃতি এবং প্রশান্ত বিজ্ঞতার পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁরা দেখতে পেলেন লিন্ সেনের মধ্যে। পরিণত বয়সেও তাঁর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর; সাদা ধব্‌ধবে, লম্বা, হাল্কা দাড়ি; পরণে লম্বা কালো গাউনের ওপর একটি কোট; চোখে 'রিম্‌লেস্' চশমা; চোখ দু'টি জ্ঞান-দীপ্ত ও করুণায় স্নিগ্ধ।

অধ্যাপক তান ইয়েন শান অনর্গল শুদ্ধ ইংরাজী বলতে পারেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় ডাক্তারদের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট লিন্ সেনের আলাপ চলল। লিন্ সেন প্রথমেই মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলালের কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর চীন ও ভারতের বহুকালাগত 'সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক আলোচনা করলেন। এই দুই মহাজাতির সম্যক্ মিলনের প্রয়োজনীতার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ডাক্তারদের মনে হ'ল, একজন সত্যি-কারের মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁরা আলাপ ক'রে এলেন।

অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে ডাক্তাররা এখানে পরিচিত হলেন তাঁদের মধ্যে তাই চি তাও একজন। ইনি কুওমিন্‌টাঙ্গের একজন প্রবীণ কর্মী এবং পরীক্ষা "য়ুআনের" * প্রেসিডেণ্ট।

* চীন সরকারের কার্যকলাপ পাঁচটি "য়ুআন" বা বিভাগে বিভক্ত—শাসন, আইন-প্রণয়ন, পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রণ ও বিচার।

ইনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ডাক্তারদের সঙ্গে নানা বিষয়ে ইনি আলোচনা করলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন যে, প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজস্ব জীবন-দর্শন প্রয়োজন। তাঁর মতে চীনের যা প্রয়োজন, তা ধনতন্ত্রও নয়, কম্যুনিজম্‌ও নয়—চীনের প্রয়োজন "সান্‌ মিন্‌ চু-ই" অর্থাৎ ডাঃ সান্‌ ইয়াৎ সেনের বিখ্যাত ত্রি-নীতি।

তাঁদের সম্বর্দ্ধনার জন্য চুংকিঙেও অনেকগুলি প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-পরিষদের (Central Political Council) উদ্যোগে যে ভোজ দেওয়া হয়, তাতে চীন-সরকারের বড় বড় কর্মচারীরা সবাই উপস্থিত ছিলেন। কুওমিনটাঙ্গের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তাঁদের একটি মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করে। এই অনুষ্ঠানে চীনের স্বাস্থ্য-সচিব ডাঃ এফ্‌. সি. ইয়েনের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। ডাঃ ইয়েনের কাছে তাঁরা শুনলেন যে তাঁদের ইয়েনানে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু ক্যাণ্টন জাপানীদের হস্তগত হবার দরুণ তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য মোটর গাড়ী আসবে ইন্দো-চীনের মধ্য দিয়ে ঘুরে; তাই তাঁদের কিছুদিন চুংকিঙে অপেক্ষা করতে হবে। স্থানীয় চীনা-ভারতীয় সমিতি এবং বৌদ্ধ সমিতি মিলিত ভাবে তাঁদের একটি ভোজ দেয়। এ ভোজে নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পাকা রাঁধুনিদের কৌশলে রান্না হয়েছিল ঠিক মাংসের মত ক'রে। তাই বৌদ্ধধর্মের অহিংসা-নীতি লঙ্ঘন না ক'রেও অতিথিরা কল্পনা

করতে পারলেন যে তাঁরা "মুরগীর" রোস্ট্, "হাঁস"-সেদ্ধ, "মটন্" কাটলেট ইত্যাদি খাচ্ছেন !

* * *

ইয়েনানে যাবার জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলেন। কোথায় রণাঙ্গণে যেয়ে আহতদের সেবা করবেন, তা-না এই রাজধানীতে ব'সে ভোজ খাচ্ছেন আর প্রশস্তি শুনছেন !

সময় কাটাবার জন্য তাঁরা একদিন সিনেমায় গেলেন, "ইফ্ ওঅর কাম্‌স্ টু-মরো" নামে একটি নাৎসি-বিরোধী সোভিয়েট ছবি দেখতে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের ওপর নাৎসিদের একটি কল্পিত আক্রমণ এবং জনগণের মিলিত প্রতিরোধে শত্রুর পরাজয়—এই সে ছবির আখ্যানভাগ। ভবিষ্যতের ঘটনা কি আশ্চর্যভাবেই না কল্পনা করা হয়েছিল এই ছবিখানিতে !

হ্যাঙ্কাউয়ে অষ্টম পন্থা বাহিনীর এবং "নবীন চীনা দৈনিকের" যে সব কর্মীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল, চুংকিঙে তাঁরা আবার সেই সব পুরানো বন্ধুর দেখা পেলেন। পথে এঁদের অনেক সহকর্মীর যে শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল, সেই কাহিনী তাঁরা এঁদের মুখ থেকে শুনলেন। এইসব নিহত কর্মীর স্মৃতিকে সম্মান দেখাবার জন্য "নবীন চীনা দৈনিকের" উদ্যোগে একটি সভা হয়। ভারতীয় ডাক্তাররা এই সভায় যোগ দিয়ে কংগ্রেস ও ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে এই শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মাল্যার্পণ করেন। একটি বড়

হলে সভা হয়। অনেক কম্যুনিস্ট এবং বামপন্থী কর্মী এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। মঞ্চের ওপর সর্বোচ্চে স্থাপিত ছিল ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের একখানা ছবি : ছবির মাথায় চীনের জাতীয় পতাকা এবং কুওমিনটাঙ্গের পতাকা পাশা-পাশি উড়ছিল। আশ্চর্যের কথা এই যে সভা-গৃহে একটিও লালঝাণ্ডা নজরে পড়ছিল না। ডাক্তাররা পরে জানতে পারেন, চীনা কম্যুনিস্টরা লালঝাণ্ডা ব্যবহার করে না, চীনের জাতীয় পতাকাকেই তারা নিজেদের পতাকা ক'রে নিয়েছে। তিন ঘণ্টা ধ'রে সভার কাজ চলল। বক্তাদের মধ্যে একজন ফ্যাসি-বিরোধী জাপানী তরুণী, একজন কোরীয়ান বিপ্লবী এবং একজন মার্কিন সাংবাদিক ছিলেন। ভারতীয় মিশনের পক্ষ থেকে ডাঃ বসু বক্তৃতা দিলেন—এই তাঁর জীবনে প্রথম বক্তৃতা! ভারত ও চীনের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তা শ্রোতাদের কাছে খুব প্রশংসা পেল।

কোন কাজকর্ম ছিল না ব'লে তাঁরা একদিন পাহাড়ে চড়ে উষ্ণ-প্রস্রবণ দেখতে গেলেন। পথে সিনকিয়াঙ্ থেকে আগত একদল ছাত্রের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'ল এরা চীন সরকারের কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে। সিনকিয়াঙ্ চীনের এক সুদূর প্রান্তে অবস্থিত। এর একদিকে কাশ্মীর আর একদিকে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সীমানা। এর এই অবস্থান রাজনীতির দিক দিয়ে

খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই এর ওপর বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির লুব্ধ দৃষ্টি আছে। কিছুদিন আগেই সিনকিয়াঙ্ নিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতিবিশারদদের মধ্যে রীতিমত জটিল ষড়যন্ত্র চলছিল। এখানকার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান—জাতিগতভাবে এরা চীনা ও তুর্কোমান জাতির সংমিশ্রণ-জাত। একবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় "স্ব-তন্ত্র" সিনকিয়াঙ্ রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা হয়েছিল। এই পরিকল্পিত রাষ্ট্রের ভাবী সুলতানরূপে খালিদ শেলড্রেক নামে একজন ইসলামধর্মে দীক্ষিত ইংরাজের নাম তখন প্রায়ই শোনা যেত। এখন কিন্তু সিনকিয়াঙের অধিবাসীরা চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সম্পূর্ণভাবে অনুগত। যে ছাত্রদের সঙ্গে ডাক্তারদের দেখা হ'ল, তারা চীনের অন্যান্য যুবকদের মতই দেশপ্রেমিক। এদের মধ্যে কয়েকটি ছেলে বেশ হিন্দুস্থানী বলতে পারে। তারা না-কি কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব থেকে ঘুরে এসেছে।

চুংকিঙে একজন মাত্র ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল। লোকটি একজন বুড়ো পেশোয়ারী হেকিম। চক্ষু-চিকিৎসায় তার বেশ পসার আছে। অনেক দিন ধ'রে সে চীনে আছে—প্রথমে ছিল সাংহাইতে, তারপর হ্যাঙ্কাউয়ে, অবশেষে সে নূতন রাজধানী চুংকিঙে এসেছে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য।

* * * *

চীনে বিদেশীদেরও নিজেদের 'ভিজিটিং কার্ডে' চীনা হরফে

চীনা নাম ছাপিয়ে নিতে হয়। অধ্যাপক তান ইয়েন শানের পরামর্শে ভারতীয় ডাক্তাররা চীনা ভাষায় নিজেদের নামকরণ করলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা নিজেদের নামের শীলমোহরও তৈরী করিয়ে নিলেন, কারণ শীলমোহর ছাড়া চীনে কোন দলিলেই সই করা চলে না।

ডাঃ অটলের নাম হ'ল "আন তে হুআ" (চীনের শান্তি ও সদ্‌গুণ) চোলকার হলেন "চো কাই হুআ" (চীনের উন্মুক্ত ভোজের আসর); কোট্‌নিস্ হ'লেন "খো তে হুআ" (চীনের সম্ভবপর সদ্‌গুণ); মুখার্জির নাম হ'ল "মু খে হুআ" (চীনের খোদিত চিত্র); আর ডাঃ বসু নিজের নাম বজায় রেখে হলেন "বা সু হুআ" (চীনের চিন্তা)। "হুআ" কথাটির মানে চীনও হয়, আবার ফুলও হয়। চীনের প্রতি তাঁদের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করবার জন্যই প্রত্যেকের নামের সঙ্গে এই কথাটি জুড়ে দেওয়া হ'ল।

ইয়েনানে যাবার জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত স্থানীয় মিউনিসিপাল হাসপাতাল এবং রেড্‌ক্রশ হাসপাতালেই তাঁরা কাজ সুরু করে দিলেন। দু'টি হাসপাতালই খুব সুপরিচালিত। রোগীরা অধিকাংশই বে-সামরিক। বস্তুত এ দু'টি হাসপাতালে তাঁদের করবার মত কাজ বিশেষ ছিল না।

এমন সময় সুরু হ'ল বিমান-হানার পালা। জাপানীরা ইতিমধ্যে হ্যাঙ্কাউ এবং তার খানিকটা পশ্চিমেও নূতন

বিমান ঘাঁটি করেছিল। চুংকিঙের ওপর হানা দেবার জন্য তারা এইসব ঘাঁটি থেকে দূরে পাল্লার বোমারু বিমান পাঠাতে লাগল। এ সব হানার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চীনের শাসনযন্ত্রকে বিকল করা এবং নাগরিকদের মনোবল কমিয়ে দেওয়া। বিমান-হানার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পাহাড়ের গা কেটে চুংকিঙের বিখ্যাত আশ্রয়কক্ষগুলি তখনও তৈরী হয়নি, তাই প্রত্যেক হানাতেই অনেক লোক হতাহত হ'ত।

পনেরোই জানুয়ারী (১৯৩৯) খুব শীত পড়েছিল, কিন্তু দিনটি ছিল বেশ পরিস্কার। সাতদিন সমানে কুয়াসা ও অন্ধকারের পর সেদিন সবে রোদ উঠেছে। সবাই আনন্দে উৎফুল্ল, চারিদিকে স্ফূর্তি ও সজীবতার ভাব। সেই দিনই জাপানী বিমানবহর চুংকিঙের ওপর প্রথম হানা দিল।

এমন তীব্র এবং ভয়াবহ বিমান আক্রমণের অভিজ্ঞতা ভারতীয় ডাক্তারদের এর আগে আর হয়নি। এরই নাম 'ঝঞ্ঝা'-আক্রমণ (Blitz)। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপানীরা বে-সামরিক অধিবাসীদের ওপর এই নির্মম ও কাপুরুষোচিত আঘাত হানে। এই আক্রমণের সময় তাঁরা একটি রেস্তোরাঁয় ছিলেন। তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত শব্দ ক'রে বাতাসের মধ্য দিয়ে বোমাগুলি নেমে আসছে, তারপর বিস্ফোরণের সুতীব্র শব্দ, বোমার আঘাতে বাড়ীঘর ধ্বসে পড়ছে, বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলি গর্জন করছে, চীনা জঙ্গী

বিমানের গুঞ্জন-ধ্বনি, 'মেসিন গানের' দুমদাম শব্দ—এ সবই তাঁরা সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন। কাছাকাছি যতবার বোমা পড়ছে রেস্তোরাঁর বাড়ীটি ততবারই কেঁপে উঠছে, মেয়েরা ভয়ে আর্তনাদ করছে—এ রকম অবস্থায় খুব সাহসী লোকেরও মনে রীতিমত ভয় হয়।

হঠাৎ একটা বোমা পড়বার ভীষণ শব্দে এবং কর্ণভেদী বিস্ফোরণে সবাই চমকে উঠলেন। রেস্তোরাঁর কাঠের বাড়ীটি সমূলে থরথর ক'রে কেঁপে উঠল; জানালার শার্শি চূরমার হ'য়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল; টেবিল থেকে গ্লাস ও পেয়ালাগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল; দেওয়াল থেকে, ছাদের ভেতর থেকে পলেস্তারা খসে পড়তে লাগল। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে এল কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া এবং কোন কিছু পুড়বার একটা উৎকট গন্ধ। ক্ষণকালের জন্য সবাই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একটু পরে নিরাপত্তার সঙ্কেত ধ্বনিত হ'তেই সবাই ছুটে রাস্তায় বেরোলেন। বেরিয়ে দেখেন, রাস্তার ঠিক ওপারেই একটা প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ী আগাগোড়া চূরমার হয়ে গেছে; ধ্বংসস্তূপ থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বায়ুস্রোতে বোমাটার গতিপথ যদি মাত্র বিশ ফুট বেঁকে যেত, তা'হলে আর এ দৃশ্য দেখবার জন্যে তাঁদের কাউকে বেঁচে থাকতে হ'ত না। এ কথা ভাবতেই ভয়ে তাঁদের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

হাতে যখন কাজ থাকে, তখন কোন দুশ্চিন্তা

করবার মত অভ্যাস ডাক্তারদের থাকে না। মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করবার কাজে এ. আর. পির লোকদের সাহায্য করতে লেগে গেলেন। জীবিত অবস্থায় যারা ভগ্নস্তূপের ভেতর চাপা পড়েছে, তাদের তাঁরা টেনে বার করতে লাগলেন। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য! হতাহতের অধিকাংশই নারী ও শিশু, কারণ সে বাড়ীর পুরুষরা সবাই কারখানার মজুর—তারা কাজে বেরিয়েছিল। গুণে দেখা গেল, ঐ একটি বোমাতেই ত্রিশ লোকের প্রাণহানি হয়েছে। চারিদিকে খণ্ডবিখণ্ড বিকৃত মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিল। সবচেয়ে করুণ দৃশ্য—একটি তরুণী মাতা, শিশু সন্তানটি তখনও তার বক্ষোলগ্ন; তাদের শরীরে একটি আঁচড়ও লাগেনি মস্তিষ্কের স্নায়ুতে তীব্র ঝাঁকুনি লেগে ঐ অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের স্ট্রেচারে ক'রে হাসপাতালে পাঠান হ'ল। ডাক্তাররা গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার, অঙ্গচ্ছেদ, ক্ষত-চিকিৎসা ইত্যাদি করলেন। এর আগে ক্যাণ্টন, হ্যাঙ্কাউ এবং ইচাঙে তাঁদের বিমানহানার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিন্তু বিভীষিকাময় মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এই তাঁদের প্রথম অগ্নি ও রক্তে দীক্ষা হ'ল।

* * *

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে জীবনের নূতন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। বিপদ যত ভয়ঙ্কর, জীবনকে উপভোগ করবার

ইচ্ছাও তত তীব্র হয়ে ওঠে। ডাক্তাররা এর আগে অনেক তরুণ চীনা বৈমানিককে আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতে দেখেছেন। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হ'তে পারে জেনেও এরা দিব্যি হাসিমুখে রেস্তোরায় হৈ-চৈ করছে, বিলিয়ার্ড খেলছে, মদ খাচ্ছে। এই ভীষণ বিমান-হানার পর ডাক্তাররা এদের এই বেপরোয়া ভাবের যথার্থ রূপ বুঝতে পারলেন। 'হেসে নাও দু'দিন বইতো নয়'—এই এদের মনোভাব। শুধু চুংকিঙে নয়, যুদ্ধ-সংকুল পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ লক্ষ লোক এই রকম বেপরোয়া অদৃষ্টবাদের বশবর্তী হয়ে উঠেছিল।

* * * *

আধুনিক চীনা নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য তাঁরা খুব উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন ব'লে ডাঃ ওআঙ্গ একদিন তাঁদের অভিনয় দেখাতে নিয়ে গেলেন। যে নাটকটি অভিনীত হ'ল, তার নামটি কথায় কথায় অনুবাদ করলে মানে দাঁড়ায় "পাঁচ বছর পরের সাংহাই।" সন্ধ্যা আটটা থেকে রাত একটা—এই পাঁচ ঘণ্টা ধরে অভিনয় চলল! বিরাট দৈর্ঘ্য ছাড়া আর কোন দিক দিয়েই ভারতীয় নাটকের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা নিখুঁত, প্রায় বাস্তবের মত। মঞ্চের ওপর দেখা যাচ্ছিল সাংহাইয়ের শ্রমিক-প্রধান অঞ্চলের একটা দোতালা 'ফ্ল্যাট'-বাড়ীর খানিকটা অংশ। এমন ভাবে মঞ্চ সাজানো ছিল যে

নাটকের মুখ্য পাত্র-পাত্রীদের জীবনে যা ঘটছিল, তা তো দেখা যাচ্ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে সেসব ঘটনায় তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল, তাও দেখা যাচ্ছিল।

নাটকটির আখ্যান-ভাগ খুবই সরল। নাটকীয় সংলাপ কিছু না বুঝলেও কাহিনীর গতি ধরতে ডাক্তারদের খুব অসুবিধা হ'ল না। দুই বন্ধুকে নিয়ে নাটক। তাদের মধ্যে একজন বিবাহিত—সে তার স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে বন্ধুর তত্ত্বাবধানে রেখে মাঞ্চুরিয়ায় যায়। সেখানে সে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়। এদিকে পাঁচবছর যাবৎ তার কোন খবর না পেয়ে সাংহাইয়ে তার পরিচিতরা ধরে নেয় যে সে ম'রে গেছে। তার বন্ধু ও পত্নী পরস্পরের প্রেমে পড়ে এবং স্বামী-স্ত্রীভাবে বাস করতে থাকে। ইতিমধ্যে তাদের অজ্ঞাতসারে প্রথম বন্ধু মাঞ্চুরিয়া থেকে ফিরে আসে। সে দেখল যে তারা বেশ সুখেই আছে। তাদের এ সুখ ভেঙে দিতে তার ইচ্ছা হ'ল না—সেনাদলে যোগ দিয়ে সে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলে গেল। অভিনয় খুব স্বাভাবিক হয়েছিল। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনি শুনে ডাক্তাররা বুঝতে পারলেন যে নাটকটির সংলাপ জাতীয় উদ্দীপনায় পূর্ণ। নাটকীয় পট-ভূমিকায় জাপ-বিরোধী ভাবধারার স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছিল।

* * *

চীনের শোচনীয় দুরবস্থার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের খাপ

খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় ভারতবর্ষ থেকে এল ব্যক্তিগত দুর্দৈবের এক মর্মন্তুদ সংবাদ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে তাঁরা টেবিলের ওপর একগাদা চিঠি দেখলেন। দেশের চিঠি পেয়ে সবাই আনন্দে আত্মহারা! যে যার চিঠি বেছে নিয়ে পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণের জন্য সবাই কোট্‌নিসের কথা ভুলে গেলেন। হঠাৎ একজনের নজরে পড়ল কোট্‌নিস্ স্তব্ধ হয়ে আগুনের ধারে ব'সে আছেন—দু'চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ ক'রে জল পড়ছে; বন্ধুদের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি শুধু বললেন যে তাঁর পিতার মৃত্যু-সংবাদ এসেছে।

এই শোচনীয় ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তাঁরা পরে জানতে পারেন। কোট্‌নিসের পিতা যখন বোম্বাইয়ের ব্যালার্ড পীয়ারে ছেলেকে বিদায় দিতে আসেন, তখন তাঁরা সবাই তাঁকে দেখেছিলেন। ভদ্রলোক শোলাপুরের কোন মিলে কেরাণী ছিলেন। ছেলেকে তিনি বোম্বাই মেডিকাল কলেজে পড়তে পাঠান। দীর্ঘ পাঁচবৎসর যাবৎ অনবরত ঋণ ক'রে তিনি তার পড়বার খরচ চালিয়েছিলেন। আশা ছিল, ছেলে পাশ ক'রে রোজগারের টাকায় সব ঋণ শোধ ক'রে দেবে। ছেলে দ্বারকানাথ কিন্তু এই ঋণের কথা কিছুই জানতেন না। কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি ঠিক করলেন যে কংগ্রেস মেডিকাল মিশনের সঙ্গে চীনে যাবেন। বৃদ্ধ পিতা তাঁর এই সঙ্কল্পে কোন বাধা দিলেন

না। এতেই বুঝতে পারা যায়, দেশের জন্য তিনি কত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। ছেলেকে তিনি আশীর্বাদ করলেন; এত বড় কাজে যে তাঁর ছেলে নির্বাচিত হয়েছেন, এ জন্য তিনি গর্ব বোধ করলেন। এদিকে তাঁর আর্থিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে আসছিল। ঋণের বোঝা সহন করতে না পেরে তিনি অবশেষে আত্মহত্যা করেন।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা গ্রীক ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর ফলে দ্বারকানাথের মনে যে কি ঝড় বয়ে গেল, তা অনুমান করাও শক্ত। তাঁর সহকর্মীরা এই দুর্ঘটনার কথা শুনে নিতান্ত দুঃখিত হ'লেন। কোট্‌নিস্‌কে তাঁরা দেশে মা-বোনের কাছে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু সেই মর্মভেদী শোকের মধ্যেও তরুণ দ্বারকানাথ অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। সহকর্মীদের অনুরোধের উত্তরে তিনি যা বললেন, তার মর্ম এই: "আমি ফিরে যেতে পারি না। কংগ্রেস আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আসবার সময় আমরা এই ব'লে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছি যে একবছর পূর্ণ হবার আগে আমরা কেউ ফিরে যাব না। বাবা যখন চরম আত্মোৎসর্গ করেছেন, তখন যে-সেবাব্রতের প্রতি তাঁর এত শ্রদ্ধা ছিল, সেই ব্রতে জীবন উৎসর্গ করা ছাড়া অন্য পথ আমার নেই।"

এর পর থেকে কোট্‌নিসের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল চীনের জনগণের সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা,

তাদের ভাল ক'রে সেবা করবার জন্য চীনের ভাষা ও রীতি-নীতি শেখা।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তাঁরা যখন মোটরযোগে চুংকিঙ্ থেকে ইয়েনানের পথে যাত্রা করলেন, কোট্‌নিসের শোক-জর্জর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নূতন আশার আলোয়, যেন তিনি কোন এক বিপুল আনন্দ ও বিজয়ের পথে চলেছেন।

কিন্তু এ যে তাঁর মরণের অভিসার!

অসামান্য মিঃ য়্যালে

"কর্মহীনতাই একমাত্র অসাফল্য।"

—মার্শাল চিয়াং কাই-শেক।

"কেন যেন চীন সম্বন্ধে কোনমতেই হতাশ হওয়া চলে না। যখনই মনে হয় সব বুঝি শেষ হয়ে এল, তখনই দীপ্ত উল্কার মত এইরকম একটা ঘটনা এসে দেখিয়ে দেয়, এই মহাজাতির মধ্যে কি বিরাট জীবনীশক্তি নিহিত রয়েছে।"

—নিম ওয়েল্‌স্ ("চায়না বিল্‌ডস্ ফর ডেমোক্র্যাসি")।

"এই মনোজ্ঞ প্রচেষ্টা এরই মধ্যে অনেক কিছু করেছে। ভবিষ্যতের প্রচুর সম্ভাবনাও রয়েছে এর মধ্যে নিহিত ......চীনের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে অমূল্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক কিছু শেখাতে পারে।"

— জওহরলাল নেহরু ("চায়না বিল্‌ডস্ ফর ডেমোক্র্যাসি"র ভূমিকা)।

চুংকিঙের সেই ভয়াবহ বিমান-হানার কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। মৃত্যুভয়ের চেয়েও তীব্রতর বিভীষিকা আছে। সে বিভীষিকা রয়েছে অতর্কিত, নির্বিচার বিমান-আক্রমণের অনিশ্চয়তার মধ্যে। পর-মুহূর্তে কি বেঁচে থাকব, না বোমার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ব চারিদিকে? আমার শেষ চিহ্ন কি থাকবে শুধু দেওয়ালের ওপর খানিকটা রক্তের ছাপ?—এই অনিশ্চয়তা সহস্র মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও ভীষণ। এ অবস্থায় শুধু বেঁচে থাকবার আদিম প্রবৃত্তিতে বিলীন হয়ে যায় মানুষের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত হৃদয়াবেগ!

চুংকিঙের সর্বত্র তখন অবিরাম বোমা পড়ছে। একটা

বড় রেস্তোরাঁয় দুইশতাধিক লোকের মধ্যে আমাদের ডাক্তার পাঁচজনও আছেন। এই বিরাট জনতা নিস্পন্দ—কেউ জড়সড় হয়ে ব'সে আছে, কেউ বা শঙ্কিত উদ্বেগে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকের হাত থেকে 'চপ্-স্টিক্' খসে পড়েছে; পাত্রে 'সূপ' ঠাণ্ডা হচ্ছে; চালভাজা, চিংড়ি-মাছ প্রভৃতি খাদ্যসম্ভারে বোঝাই থালা অনাদরে টেবিলের ওপর প'ড়ে আছে। এমন সময় কি কারও খাবার কথা মনে হ'তে পারে?



অথচ দেখা গেল একটি লোক এরই মধ্যে বেশ নির্বিকার ভাবে খেয়ে চলেছেন যেন কিছুই হয়নি! সকলে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল, যেন পৃথিবীর নবম আশ্চর্য তিনি। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণের জন্য সবাই যেন বিমান-হানার কথাও ভুলে গেল।

ভদ্রলোক মাঝ-বয়সী; শরীরের গড়ন বেশ আঁটসাঁট; রোদে-পোড়া, জলে-ভেজা গোছের চেহারা: মাথায় লাল চুল; পরণে সাদাসিধে শার্ট এবং শর্ট। চারিদিকে যে এত বোমা পড়ছে, সে দিকে তাঁর যেন লক্ষ্যই নেই—বেশ ধীরে সুস্থে খেয়ে চলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে একখানা খবরের কাগজ পড়ছেন প্রশান্ত গম্ভীর মুখে। ভদ্রলোককে দেখে ইয়ুরোপীয় মনে হচ্ছে, অথচ তিনি পড়ছেন একখানা ভারতীয় খবরের কাগজ, "বোম্বে ক্রনিক্‌ল"—এ ব্যাপার দেখে ভারতীয় ডাক্তাররা স্বতঃই উৎসুক হলেন এই রহস্যজনক লোকটির

পরিচয় জানবার জন্য।

তাঁরা উঠে তাঁর টেবিলের কাছে যেতেই ভদ্রলোক খাওয়া বন্ধ ক'রে একবার তাঁদের দিকে, একবার হাতের খবরের কাগজের দিকে তাকালেন; তারপর হাসিমুখে তাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমার নাম রিউই য়্যালে। আপনারা নিশ্চয়ই ভারতীয় মেডিকাল মিশনের ডাক্তার! বসুন।" 'বোম্বে ক্রনিক্‌লে' তাঁদের ছবি দেখছিলেন ব'লে মিঃ য়্যালে সহজেই তাঁদের চিনতে পারলেন।

ডাক্তাররা যখন বিস্মিত ভাবে জানতে চাইলেন, আশে পাশে এত বোমা-বর্ষণের মধ্যে তিনি কি ক'রে এমন নিশ্চিন্ত ভাবে, একমনে খাচ্ছেন, মিঃ য়্যালে প্রাণখোলা সরল হাসি হেসে বললেন, "এমন চমৎকার খাওয়াটা নষ্ট ক'রে লাভ কি? মরতেই যদি হয়, তো বেশ ভরা-পেটে, শান্তিতে মরাই ভাল।"

এমনি ক'রে বিখ্যাত রিউই য়্যালের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হ'ল। এঁর সম্বন্ধে তাঁরা আগেও কিছু কিছু শুনেছিলেন। মিঃ য়্যালের জন্ম নিউজীল্যাণ্ডে, কিন্তু তিনি চীনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং চীনের উন্নতির জন্যই নিজের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করেছেন।

শীগ্‌গিরই তাঁরা এই আশ্চর্য লোকটি এবং এঁর 'চাইনিজ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ' (সংক্ষেপে সি-আই-সি) আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারলেন। মিঃ য়্যালে এই

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সংগঠনের* অন্যতম স্থাপয়িতা, প্রধান পরামর্শদাতা এবং সম্পাদক—সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি একাধারে এর পিতা, মাতা এবং ধাত্রী!

রিউই য়্যালে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু এর পরিণতি তাঁর আদর্শবাদকে ভেঙ্গে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আইরিশ আদর্শবাদ, 'পিউরিটান'-সুলভ চিন্তা-গাম্ভীর্য, নূতন পথে চলার একগুঁয়েমি এবং ন্যায়-সঙ্গত সমাজবিধান সম্বন্ধে সুতীব্র আগ্রহ! তাঁর পিতা ছিলেন বিশেষ প্রগতিশীল সামাজিক মতবাদসম্পন্ন একজন স্কুল-মাস্টার; তিনি সমবায়ী কৃষি ব্যবস্থার একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন নিউজীল্যাণ্ডে নারীদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রথম নেত্রীদের অন্যতম

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর তরুণ মিঃ য়্যালে কয়েক বছর যাবৎ মেষ-পালনের ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এর পর তাঁর চঞ্চল মনকে পেয়ে বসল দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা। ব্যবসা বেচে দিয়ে তিনি রওনা হলেন চীনে—উদ্দেশ্য ছিল, চীনের এই নূতন বিপ্লবের ভিতরের কথাটা ভাল ক'রে জানা। সাংহাইয়ে এসে তিনি মিউনিসিপালিটির অধীনে কারখানা-পরিদর্শকের কাজ পেলেন।

*চীনের ইণ্ডাসট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য Nym Wales এর লেখা এবং জওহরলালের ভূমিকা সম্বলিত "China Builds for Democracy" পঠিতব্য। বইখানা প্রকাশ করেছেন কিতাবিস্তান, এলাহাবাদ।

চীনের জাতীয় বিপ্লবের ওপর গোড়া থেকেই তাঁর সহানুভূতি ছিল। এবার চীনা মজুর এবং বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তিনি সর্বতোভাবে তাদের সমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন। দৈনন্দিন কার্য ব্যপদেশে তিনি চীনা মজুরদের যে অবস্থা দেখতে পেলেন, তা নিতান্ত শোচনীয়। তাদের মজুরীর হার খুবই কম ; থাকতে হয় জঘন্য বস্তিতে ; যে সব কারখানায় তারা কাজ করে, সেখানে অহরহ দুর্ঘটনা হয় ; অথচ সে জন্য না আছে উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা, আর না আছে মজুরদের জন্য বীমা, চিকিৎসা কিংবা দুর্ঘটনা-জনিত অক্ষমতার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। নিজের পদমর্যাদার সাহায্যে তিনি মজুরদের অবস্থার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ধর্মঘট এবং শ্রমিক-সংক্রান্ত গোলযোগে তিনি সরকারপক্ষ থেকে সালিশ নিযুক্ত হতেন। সেই সুযোগে তিনি মজুরদের জন্য যতটা সম্ভব সুবিধা আদায় ক'রে নিতে ছাড়তেন না। ফলে সাংহাইয়ের মজুররা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতে এবং ভালবাসতে সুরু করল। এদিকে তাঁর উন্নত চরিত্রের জন্য কারখানার মালিকরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করত। বার্ষিক ছুটিগুলি তিনি কাটাতেন দেশের অভ্যন্তরে ঘুরে, গ্রাম্য কুটির-শিল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং চীনের ভাষা ও আচার-ব্যবহার শিখে। ১৯২৮-২৯ খৃস্টাব্দে সুইয়ানের দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৩১ খৃস্টাব্দে ইয়াংসি নদীর বন্যার সময় লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ও গৃহহীনের

সাহায্যের জন্য এবং তাদের নূতন ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন। চীনাদের সঙ্গে নিজের পরিপূর্ণ একাত্মতার নিদর্শন স্বরূপ দু'টি অনাথ বালককে নিজের কাছে নিয়ে এসে তিনি নিজের ছেলের মতই তাদের লালন পালন করতে থাকেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনে শ্রমশিল্পের নবজন্মের কল্পনা তাঁর মাথায় এল। কয়েকজন মার্কিন ও চীনা বন্ধুর সঙ্গে তিনি এ সম্বন্ধে নানারকম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল, শ্রমিকদের সমবায় প্রতিষ্ঠান দিয়ে সারা দেশ ছেয়ে ফেলতে হবে। মনে যা ভাবেন, তখনই তা কাজে পরিণত করতে হবে, এই হ'ল য়্যালের বৈশিষ্ট্য। কয়েকজন উৎসাহী তরুণ চীনা ইঞ্জিনিয়ারের সহযোগিতায় এবং চীন সরকার এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অর্থসাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই রিউই য়্যালের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হ'ল।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিলঃ—

(১) জাপানীদের অর্থনৈতিক অবরোধ এবং অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে দেশে জাপানী মালের প্রবেশ সত্ত্বেও, চীনকে শ্রমশিল্পের দিক দিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ক'রে তোলা হবে। যুদ্ধের দরুণ বাইরে থেকে বড় বড় যন্ত্রপাতি আমদানি করবার উপায় ছিল না, তাই ঠিক হ'ল এই সব যন্ত্রপাতি ছাড়াই

কাজ চালাতে হবে।

(২) শ্রমশিল্পের বড় বড় কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে দেশের অভ্যন্তরভাগে, যাতে জাপানী বিমান-হানায় এদের কোন ক্ষতি না হয়। যে সব জায়গা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা আছে, সেখানে ছোট ছোট ভ্রাম্যমান শিল্পকেন্দ্র খোলা হবে, যাতে প্রয়োজন বোধে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া চলে।

(৩) লক্ষ লক্ষ আশ্রয়-প্রার্থী, যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের স্ত্রী-পুত্র এবং অক্ষম সৈন্যদের জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

এ ছাড়া এই পরিকল্পনার আর একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল রিউই য়্যালে এবং তাঁর সহকর্মীদের মনে। তাঁদের আশা ছিল যে সমবায়-প্রথায় দৈনন্দিন কাজ করবার ফলে কর্মীরা গণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারবে, তারা আরও আত্মনির্ভরশীল এবং উদ্যমশীল হয়ে উঠবে; চীনগণতন্ত্রের নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তারা অত্যাচারের প্রতিরোধ করবার ইচ্ছা এবং বল দুই-ই অর্জ্জন করবে।

রিউই য়্যালে এবং তাঁর কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করবার সুযোগ ভারতীয় ডাক্তাররা এর পর পেয়েছিলেন, কারণ চুংকিঙ্ থেকে ইয়েনান যাবার সময় তিনি তাঁদের

সহযাত্রী ছিলেন। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের জুনমাসে তিনি হ্যাঙ্কাউয়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংগঠন করেন। ভারতীয় ডাক্তারদের চীনে আসবার কয়েকমাস আগে তিনি "শ্রমশিল্পের কেন্দ্রকে ইয়াংসি নদীর উজানে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করেন"।* আগস্ট মাসে "একহাজার আশ্রয়-প্রার্থী এবং কিছু যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে ট্রেণে ক'রে তিনি সুদূর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যান এবং সেখানে শ্রমশিল্পের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন।"* এরপর ক্যান্টনে যেয়ে তিনি কো-অপারেটিভের জন্য কিছু টাকা ধার নেবার ব্যবস্থা করেন, কিআংসিতে যেয়ে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করেন, হুনান এবং কোআংসিতে শাখা স্থাপন করেন। পথে কয়েকবার খুব অল্পের জন্য জাপানী বোমার হাত এড়িয়ে ডিসেম্বর মাসের (১৯৩৮) শেষদিকে তিনি চুংকিঙে ফিরে আসেন। এখন (জানুয়ারী, ১৯৩৯) আবার তিনি ভারতীয় মেডিকাল ইউনিটের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমে চললেন।

একখানা য়্যাম্বুলেন্স কারে তাঁরা রওনা হলেন আর তাঁদের মালপত্র চলল একখানা য়্যাম্বুলেন্স ট্রাকে। রিউই য়্যালের মত একজন সহযাত্রীকে পেয়ে তাঁদের খুবই উপকার হয়েছিল। মিঃ য়্যালে চীনের প্রত্যেক অঞ্চলের কথ্য ভাষা বেশ ভাল ভাবে জানেন; তাই চালকদের পথ বুঝিয়ে দিতে,

*"China Builds for Democracy."

খেয়ানৌকার মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে এবং পথে নানারকম সুখ-সুবিধা ক'রে দিতে তাঁর সাহায্য খুব কাজে এল।

চুংকিঙ্ থেকে বেরোবার আগে এ-কথা তাঁদের বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে ইয়েনানের পথে তিন রকম অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, রাস্তা খুবই খারাপ, জায়গায় জায়গায় রাস্তা নেই বললেই চলে; দ্বিতীয়তঃ, পথে জাপানীরা অনবরত বোমা ফেলছিল; তৃতীয়তঃ, জাপানীরা যদি সিয়ান দখল করে, তাহ'লে শুধু ভারতবর্ষ থেকে নয়, চুংকিঙ্ থেকেও তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।

কিন্তু ইয়েনানেই তখন সবচেয়ে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চলছিল, তাই সেখানে ডাক্তারদের দরকার সবচেয়ে বেশী। অদম্য অষ্টম পন্থা বাহিনী এবং "লাল" গেরিলারা ইয়েনানেই লড়ছিল। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, যাই ঘটুক না কেন, ইয়েনানে তাঁদের যেতেই হবে।

চুংকিঙ্ থেকে তাঁরা গেলেন নাইকিআঙে। সেখানে ডাঃ কোট্‌নিসের পুরোনো বন্ধু, সরকারী শর্করা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ হুআঙের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'ল। ডাঃ হুআঙ্ ছাত্র হিসেবে একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। নাইকিআঙ্ থেকে সুরু হ'ল আখের ক্ষেত। পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে কেটে আখ এবং ধানের চাষ করা হয়েছে। চীনের এই অঞ্চলটি উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ, অথচ এখানকার

কৃষকদের দারিদ্র্যের সীমা নেই। প্রকৃতির অপরিমেয় দানের সুখ-সুবিধা ভোগ করে শুধু জমিদারেরা।

দু'দিন ক্লান্তিকর ভ্রমণের পর তাঁরা জেচুয়ান প্রদেশের রাজধানী চেঙ্-তু'তে পৌঁছালেন। পাঁচিল-ঘেরা, সরু সরু নোংরা পথঘাটে ভরা এই ছোট সহরটির লোকসংখ্যা দু'লাখের ওপর। সহরের বাইরে "পশ্চিম-চীন" বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। উপকূল অঞ্চলের কয়েকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনে এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। আমেরিকান মিশনারিদের "নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়"ও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হাজার হাজার ছাত্র ও অধ্যাপক তাঁদের পুস্তকাগার ও ল্যাবরেটরি সঙ্গে ক'রে তিব্বত-সীমান্তে অবস্থিত এই সুদূর স্থানটিতে এসেছে। এখানে পৌঁছুবার জন্য অনেককে শত শত মাইল হাঁটতে হয়েছে।

চেঙ্-তু'তে তাঁরা চার দিন ছিলেন। রিউই য়্যালে এখানকার কো-অপারেটিভ গুলি পরিদর্শন করলেন। এই কো-অপারেটিভগুলি প্রধানতঃ সুতো কাটা এবং কাপড় বোনার কাজ করে।

শীতের প্রকোপ ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছিল। ডাক্তাররা এখানে আরও গরম পোষাক এবং 'ফার'-কোট তৈরী করিয়ে নিলেন।

চেঙ্তু থেকে বেরিয়ে তাঁরা যত এগোতে লাগলেন, পথঘাট ততই খারাপ হ'তে লাগল—এখান থেকে রাস্তার

মাঝে মাঝে ভয়ানক বাঁক সুরু হ'ল। বরফের মত ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া তাঁদের গায়ে ছুঁচের মত ফুটতে লাগল। দু'হাতে দু'জোড়া পশমী দস্তানা পরা সত্ত্বেও তাঁদের হাত ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসছিল। একজন নিরক্ষর গরীব চাষীর কুটিরে তাঁরা রাত কাটালেন। লোকটি বেশ অতিথি-বৎসল। ভারতবর্ষের নামও সে কখনও শোনে নি। রিউই য়্যালে যখন তাকে বুঝিয়ে বললেন যে ভারতবর্ষেই গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল, সে কিছুতেই সে-কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তার ধারণা, গৌতম বুদ্ধ খাঁটি চীনা।

পরদিন আরও বেশী শীত পড়ল--রাস্তার অবস্থাও ক্রমেই আরও খারাপ হ'তে লাগল। সেদিন তাঁরা জেচুয়ানের সীমানা ছাড়িয়ে শেনসি প্রদেশে প্রবেশ করলেন। রাস্তায় তাঁরা দেখলেন, তুলোর গাঁট পিঠে নিয়ে সারি সারি উট চলেছে। এ অঞ্চলে পথের পাশে নির্দেশচিহ্নগুলি চীনা এবং রাশিয়ান দুই ভাষায় লেখা। এর কারণ তাঁরা বুঝতে পারলেন যখন তাঁদের নজরে পড়ল, উল্টো দিক থেকে পেট্রল, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য মালে বোঝাই অনেক রাশিয়ান লরি আসছে।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হানচুঙ্ সহরে তাঁরা সে রাত কাটালেন। প্রাচীর-বেষ্টিত এই প্রাচীন সহরটি এক কালে হান্-বংশীয় সম্রাটদের রাজধানী ছিল। এখানেও কয়েকটি কো-অপারেটিভ স্থাপিত হয়েছিল এবং আরও কয়েকটি স্থাপন করবার ব্যবস্থা হচ্ছিল।

সিআওস্যুইফুতে তাঁরা রিউই য়্যালের দ্বারা স্থাপিত একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কো-অপারেটিভ দেখতে পেলেন। অন্যান্য জায়গার কো-অপারেটিভগুলি কাপড়, কম্বল, চামড়ার জিনিষ, কাপড় বোনবার ছোট খাট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরী করে, কিন্তু এখানকার কো-অপারেটিভে চীনা সৈন্যদের জন্য মেশিনগান এবং রাইফেল তৈরী হয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে যে ধরণের রাইফেল তৈরীর 'কারখানা' আছে, এ কারখানাটি অনেকটা সেই ধরণের। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বেশীর ভাগই মুসলমান, কিন্তু ভাষায় ও পোষাকে অন্যান্য চীনাদের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য নেই। কো-অপারেটিভের কর্মীরা তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য একটি ভোজ দিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরা তাঁদের অনেক প্রশ্ন করল।

যে-সমস্ত কো-অপারেটিভ 'ডিপো' এবং কারখানায় তাঁরা যান, তার প্রত্যেকটিতেই এই জিনিষ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন যে কয়েকমাসের মধ্যেই এই পরিকল্পনা আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। কো-অপারেটিভের কর্মীরা সবাই কঠোর পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও আত্মনির্ভরশীল। অন্যান্য দরিদ্র চীনাদের তুলনায় তারা অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; সকলেই জাতীয়তাবোধের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রেরিত। এই কো-অপারেটিভগুলি যেমন শ্রমশিল্পের কেন্দ্র, তেমন নূতন সামাজিক চেতনারও

উৎস। শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টায় এই সব কো-অপারেটিভের আনুষঙ্গিক ভাবে লাইব্রেরী, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

ইনডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভের ডিপো এবং কারখানার গুলির দেওয়ালে এই ধরনের অনেক লেখা চোখে পড়ে:

ইনডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ বস্তুতঃ কর্মীদেরই প্রতিষ্ঠান। ইনডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ জাপানী পণ্য বর্জনের উপায়।

পরিচ্ছন্নতা আনে স্বাস্থ্য, আর স্বাস্থ্য আনে কর্মশক্তি।

যারা কাজ করে তারাই শুধু খেতে পাবে আমাদের সমাজে।

যদি বোমা পড়ে, আমরা নূতন ক'রে আমাদের কো-অপারেটিভ গড়ে তুলব; দশবার যদি বোমা পড়ে, দশবার আমরা পুনর্গঠনের কাজে লাগব।*

লুঙ্ঘাই রেলপথের শেষ প্রান্তে পাওচি নামে একটি ছোট সহর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভের উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছিল। জুতো, জঙ্গী উর্দি, সাবান, কাপড়, কম্বল ইত্যাদি তৈরী করবার জন্য কতকগুলি কো-অপারেটিভ কারখানা এখানে আগেই স্থাপিত হয়েছিল। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভের নিজস্ব দোকান, স্কুল, ট্রেণিং ক্লাস, ক্লাব প্রভৃতি এখানে আছে। এখানকার প্রগতিপন্থী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ

*"*Battle for Asia.*"

ওঅঙ্ ফেং-জুই'র চেষ্টায় এখানে কো-অপারেটিভ আন্দোলন খুব সমৃদ্ধি লাভ করেছে। পাওচির আর এক নাম 'কুং হো ছেং' অর্থাৎ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভের সহর। মিঃ ওঅঙ্ মাঞ্চুরিয়ার লোক। জাপানী অভিযানের পর তিনি মাঞ্চুরিয়া ছেড়েছেন। জাপানীদের প্রতি তিনি তীব্র ঘৃণা পোষণ করেন। মাঞ্চুরিয়ানদের প্রতি তাঁর বাণী হ'ল : "স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য লড়ো"। ভারতীয় ডাক্তারদের সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। তাঁদের সম্বর্দ্ধনার জন্য তিনি একটি নৈশভোজ দিলেন এবং একটি জনসভার ব্যবস্থা করলেন। এই সভায় প্রায় পাঁচহাজার লোক হয়েছিল—তাদের অধিকাংশ সৈন্য এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভের কর্মী! এ অঞ্চলটিও মুসলমান-প্রধান ব'লে ডাঃ অটল তাঁর বক্তৃতায় কোরাণ-শরীফের বাণী উদ্ধৃত করলেন এবং চীনা মুসলমানদের স্বাদেশিকতার প্রশংসা করলেন।

* * * *

পাওচিতে এসে তাঁদের পেট্রল ফুরিয়ে গেল, তাই তাঁরা মোটরগাড়ী সেখানে রেখে ট্রেনে ক'রে সিআনে রওনা হ'লেন। চীনাদের হাতে যে সামান্য কয়েকটি রেলপথ আছে, এ পথ তারই একটি। গাড়ীগুলিতে আরামপ্রদ গদি আঁটা আছে, কিন্তু জাপানী বুলেটের আঘাতে প্রত্যেকটি কামরাই শতচ্ছিদ্র। সন্ধ্যাবেলা তাঁরা শেন্‌সি প্রদেশের রাজধানী সিআনে পৌঁছালেন। এ সহরটি সামরিক কর্মতৎপরতায়

মুখর।

১৯৩৭ খৃস্টাব্দে খবরের কাগজের মারফৎ পৃথিবীর সর্বত্র সিআনের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। চীনের ইতিহাসে এ সহরটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ এখানেই "সামরিক তাগিদে" মার্শাল চিয়াং কাই-শেক্ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে লড়াই বন্ধ ক'রে জাপানীদের বাধা দিতে রাজী হন। ডাক্তাররা সিআনের 'অতিথি-ভবনে' উঠলেন। তরুণ মার্শাল চ্যাঙ্ স্যুয়ে'লিয়াঙের ইতিহাস-বিখ্যাত আক্রমণে চিয়াং কাই-শেকের প্রায় সমস্ত বড় সামরিক কর্মচারী এই 'অতিথি-ভবনে'ই বন্দী হয়েছিলেন। এই ঘটনার ফলে কম্যুনিস্ট-কুওমিন্‌টাঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের অবসান হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতীয় বাহিনী গড়ে ওঠে।

সিআনে অষ্টম পন্থা বাহিনীর একটি সংযোগ-কেন্দ্র (Liaison Office) আছে, কারণ এখান থেকেই ইয়েনানের পথ সুরু হয়েছে; উত্তর-চীনে যুদ্ধরত গেরিলাদের সংগ্রাম-ক্ষেত্রেও এখান দিয়েই যেতে হয়। এখানে 'সীমান্ত সরকারের' প্রেসিডেন্ট লিন্ পাইচুর সঙ্গে ডাক্তারদের দেখা হ'ল। লিন্ পাইচু একজন প্রবীণ বিপ্লবপন্থী। সান্ ইয়াৎ-সেনের ইনি একজন পুরানো বন্ধু। কুওমিন্‌টাঙ্গের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি ১৯২৭ সন পর্যন্ত সে-দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তারপর চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি কিআঙ্‌সিতে যেয়ে কম্যুনিস্টদের

সঙ্গে যোগ দেন। আজ তিনি চীনের মুখ্য নেতাদের অন্যতম। মিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে কার্যকরী রাখবার জন্য তিনি কম্যুনিস্ট এবং কুওমিনটাঙ্গ দু'দলের ওপরই প্রভাব বিস্তার করেন। কম্যুনিস্টদের তিনি একজন শ্রদ্ধেয় নেতা, আবার সম্প্রতি তিনি কুওমিন্‌টাঙ্গের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদেরও সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন।

লিন্‌ পাইচু তাঁদের কাছে অষ্টম পন্থা বাহিনীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর কথার মর্ম এই: "অষ্টম পন্থা বাহিনী আজ মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে জাপানীদের সঙ্গে লড়ছে। কিন্তু এ বাহিনীর সংগ্রাম শুধু চীনের মুক্তির জন্যই নয়। সমস্ত নিপীড়িত জাতি, বিশেষতঃ প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিও এ বাহিনী চায়। তাই এ বাহিনী মুখ্যতঃ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাহিনী। এ দিক দিয়ে একে ভারতীয় জনগণের বাহিনীও বলা যেতে পারে।"

ভারতীয় মেডিকাল ইউনিটকে অভিনন্দিত করবার জন্য সিআনে অষ্টম পন্থা বাহিনীর কার্যালয়ে একটি সভা হ'ল। যে ঘরে সভা হ'ল সে ঘরের নাম "জাতীয় মুক্তি-প্রকোষ্ঠ"— কম্যানিস্ট-কুওমিন্‌টাঙ্গ মিলনের আগে এর নাম ছিল "লেনিন কেন্দ্র।" ডাঃ অটল এখানে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বিবৃত ক'রে একটি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার পর সুরু হ'ল গানের পালা। ভারতীয়দের দিয়ে তাঁদের

জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ান হ'ল। ভারতীয় ডাক্তারদের সম্বর্দ্ধনার জন্য একজন তরুণ চীনা কবির দ্বারা বিশেষভাবে রচিত একটি গানও গাওয়া হ'ল। গেরিলাদের একটি জাপ-বিরোধী গান গাওয়া হ'ল, তার অর্থ কতকটা এই ধরণের—

আমাদের খাদ্য নেই,
তবু আমরা জাপানীদের সঙ্গে লড়ব।
আমাদের আশ্রয় নেই,
তবু আমরা জাপানীদের সঙ্গে লড়ব।

রাইফেল নিয়ে একটি নাচের পর সভাভঙ্গ হ'ল। নাচটি অনেকটা আফ্রিদিদের সমর-নৃত্যের মত প্রাণবান্ এবং উত্তেজক। একজন জাপানী সৈনিককে হত্যা করবার কাল্পনিক দৃশ্যে এই নাচের চরম-সন্ধিক্ষণ সূচিত হ'ল।

এখানে একটি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। ডাক্তাররা যখন লিন্ পাইচু'র সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন তাঁর তরুণ সেক্রেটারীর চট্‌পটে ভাব, সৌন্দর্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে তাঁরা অবাক হয়ে যান। অষ্টম পন্থা বাহিনীর পোষাক পরা এই সেক্রেটারীটি চমৎকার ইংরাজি বলে—কয়েকবার সে তাঁদের দোভাষীর কাজও করেছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে ইয়েনানে তাঁরা জানতে পারেন যে সেক্রেটারীটি ছেলে নয়, মেয়ে।

সিআন থেকে ইয়েনানে রওনা হবার আগে রিউই য়্যালে পাওচিতে ফিরে গেলেন পেট্রল আনবার জন্য। এর মধ্যে সেখানে কয়েকবার বিমান-হানা হ'ল, কিন্তু বিমান-হানা

তখন তাঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। একদিন তাঁরা সিআন থেকে প্রায় একত্রিশ মাইল দূরে লিন্‌টুঙে বেড়াতে গেলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চিয়াং কাই-শেক যেখানে 'বন্দী' হয়েছিলেন, সে জায়গাটি এখানে পাহাড়ের গায়ে একটি পাথরের ওপর নির্দেশ করা আছে। ইয়েনান থেকে প্রত্যাগত কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'ল। এঁদের মধ্যে ছিলেন মিস্ সি. সি. চিয়াঙ্ নামে রেড্ক্রশের একজন মহিলা চিকিৎসক এবং ক্যানাডার মিশনারি ডাঃ ব্রাউন। এঁদের কাছ থেকে তাঁরা ইয়েনানের দুরবস্থা এবং অসুবিধার খানিকটা আভাস পেলেন। অবশেষে দশই ফেব্রুয়ারী তাঁরা অষ্টম পন্থা বাহিনীর মোটরে ক'রে ইয়েনানে রওনা হ'লেন।

চেঙ্‌তুর চেয়ে সিআনের শীত অনেক বেশী, কিন্তু শেন্‌সি প্রদেশের তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য অঞ্চলে তাঁরা যে শীতের প্রকোপ অনুভব করলেন, তা সিআনের শীতকেও হার মানিয়ে দেয়! পথের দু'ধারে বরফ পড়েছে; টেলিগ্রাফের তারগুলি পর্যন্ত অনবরত তুষারপাতে সাদা হয়ে উঠেছে। পথে তাঁরা দেখলেন একখানা লরি উল্টে প'ড়ে আছে। এই লরিতে ক'রে সিন্‌কিয়াঙের সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণের কাছ থেকে অষ্টম পন্থা বাহিনীর জন্য রাশিয়ান ওষুধ-পত্র এবং প্রাথমিক প্রতিবিধানের সাজ-সরঞ্জাম আসছিল। সীমান্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের শেষ সহর লো-ছোয়ানে এসে তাঁরা একটি সামরিক বিদ্যালয়ে রাত কাটালেন।

সকালে উঠে দেখেন, তাঁদের সঙ্গে বোতলে যে জল ছিল তাও জমে বরফ হয়ে উঠেছে। তাঁদের গাড়ী প্রথমটা কিছুতেই চালানো যাচ্ছিল না, কারণ গাড়ীর রেডিয়েটার পর্যন্ত যেন রাতারাতি রেফ্রিজারেটারে পরিণত হয়েছে। রেডিয়েটারের ভেতর ফুটন্ত জল ঢেলে তবে তাঁরা গাড়ী চালাতে পারলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা কম্যুনিস্ট-শাসিত "লাল" চীনের মালভূমিতে প্রবেশ করলেন। এখানকার গ্রামগুলি দারিদ্র্যপূর্ণ হ'লেও এদের মধ্যে একটা নূতন প্রাণের আবেগ দেখা গেল। দেওয়ালে দেওয়ালে নানারকম প্রচার-বাণী লেখা এবং চিয়াং কাই-শেক, মাও ৎসে-তুঙ, চু তে' প্রভৃতির চিত্র-সম্বলিত প্রাচীরপত্র আঁটা।

সন্ধ্যাবেলা তাঁরা ইয়েনানে পৌঁছালেন—অজস্র বিমান-আক্রমণে এ সহরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তাঁরা পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই মাথার ওপর আবার এক ঝাঁক জাপানী বোমারু বিমান দেখা দিল, সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর আরও বোমা ফেলবার জন্য। খুব শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন ভাবে গাড়ী থেকে নেমে তাঁরা বরফ-ঢাকা একটি ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিলেন, যেন এই তাঁদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা। এমনি ক'রে আশ্চর্য ভাবে ইয়েনান যেন তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে নিল—এ অভ্যর্থনার বাস্তবিকই গভীর তাৎপর্য ছিল।

কম্যুনিস্‌টদের সঙ্গে ইয়েনানে

"চীনের যুবকদের পক্ষে ইয়েনানের পথই জীবনের পথ।"

—লু-স্থন্‌।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই নবেম্বর পর্যন্ত প্রায় ন'মাস ভারতীয় মেডিকাল ইউনিট ইয়েনানে ছিলেন।

চীনে তাঁরা যতদিন ছিলেন, তার মধ্যে এই ন'মাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ঘটনাবহুল। জাপানের বিরুদ্ধে চীনের আপ্রাণ প্রতিরোধের পূর্ণতর পরিচয় তাঁরা এখানে পেলেন। খ্যাতনামা মাও ৎসে-তুঙ্‌ ও অন্যান্য অদম্য কম্যুনিস্ট নেতার সঙ্গে এখানে তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল। এই যুদ্ধের আঘাতে আঘাতে চীনারা কেমন ক'রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধি ও গণ-সংস্কৃতি গড়ে তুলছিল, তা খুব নিকট থেকে দেখবার সুযোগও তাঁরা পেলেন। ইয়েনানের আর সবার মত তাঁরাও পাহাড়ের গুহায় থাকতেন। ইয়েনান থেকে বিদায় নেবার সময় এই গুহাবাসে তাঁরা এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, তখন হয়ত খোলা-জানালাওয়ালা সাধারণ ঘরে ঘুমোতে তাঁদের কষ্টই হ'ত।

এই ন'মাসে তাঁদের দলও গেল ভেঙ্গে। মে মাসে ডাঃ চোলকার ভারতবর্ষে ফিরে গেলেন, কারণ এই বৃদ্ধ বয়সে

চীনের কঠোর শীত তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। দু'মাস পরে ডাঃ মুখার্জির কিড্‌নির গোলমাল দেখা দিল। অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি হংকংয়ে গেলেন। তিনি যখন হংকংয়ে ছিলেন, সেই সময় ইয়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থরু হয়। স্থলপথ বা বিমানপথ, কোন উপায়েই হংকং থেকে চীনের অভ্যন্তরে যাবার আর উপায় নেই দেখে তিনি বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, বর্মা রোড্‌ দিয়ে চীনে ফিরে যাবেন। ভারতবর্ষে এসে তিনি চীনের জন্য কিছু ওষুধপত্র এবং চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। কিন্তু ফেরবার পথে বর্মায় বৃটিশ পুলিশ তাঁকে কোন এক অনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেপ্তার ক'রে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিল। তাঁর সঙ্গে যে-সব ওষুধপত্র ছিল, তাও বাজেয়াপ্ত হ'ল। চীনের জন্য ওষুধপত্র নিয়ে যাবার পথে ডাঃ মুখার্জিকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়, আর কেনই বা তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়, সে-রহস্য আজও কেউ ভেদ করতে পারেন নি। যাই হোক্, ৪ঠা নবেম্বর যখন ভারতীয় মিশন ইয়েনান থেকে রণাঙ্গণে যাত্রা করল, তখন মিশনের সদস্য ছিলেন পাঁচজনের বদলে তিন জন।

* * * *

ইয়েনানে তাঁদের ওপর অনেক কাজের ভার পড়ল। এখানে আসতেই তাঁদের বলা হ'ল স্থানীয় হাসপাতাল, যক্ষ্মা-নিবাস ও মেডিকাল কলেজ পরিদর্শন ক'রে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পেশ করতে। কি ক'রে

প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি করা যায়, সে সম্বন্ধেও তাঁদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হ'ল। তাঁরা যেয়ে দেখেন, প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। না আছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম, আর না আছে উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক। ভারতীয় ইউনিটের ওষুধ-পত্র যা কিছু ছিল, তা তাঁরা অষ্টম পন্থা বাহিনীর হাতে তুলে দিলেন। হাসপাতালগুলির দরকার মেটাতে এই সব ওষুধপত্র কাজে লাগল।

স্থানীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থার সাধারণ উন্নতির জন্য তাঁরা যে সব প্রস্তাব করলেন, সেগুলি তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত করা হ'ল। এ ছাড়া রণাঙ্গণ থেকে যে সব আহত সৈন্যকে আনা হচ্ছিল, প্রধানতঃ তাদের জন্য একটি নূতন হাসপাতাল খোলা হ'ল। দু'শ রোগীর উপযুক্ত এই হাসপাতালটির নাম হ'ল "অষ্টম পন্থা বাহিনীর আদর্শ হাসপাতাল"। অন্যান্য হাসপাতাল যাতে এখানকার উন্নত সংগঠন ও কর্মপন্থার অনুসরণ করতে পারে, সেইজন্য ঠিক হ'ল ভারতীয় ইউনিট এটিকে একটি আদর্শ হাসপাতালরূপে চালাবেন। সহর থেকে পনের মাইল দূরে কতকগুলি গুহায় হাসপাতালটি স্থাপিত হ'ল। ডাঃ অটল, ডাঃ কোট্‌নিস্‌ ও ডাঃ বসু হাসপাতালের কাজকর্ম দেখাশুনো করবার জন্য এখানেই রইলেন।

ডাঃ চোলকার ও ডাঃ মুখার্জির ওপর পড়ল মেডিকাল

কলেজে অধ্যাপনা করবার ভার। দোভাষীর মারফৎ চলতে লাগল তাঁদের শিক্ষাদান। এই মেডিকাল কলেজটি তখন ইয়েনান থেকে আশী মাইল দূরে পাহাড়ের গুহায় স্থাপিত ছিল। খানিকটা মোটরে, খানিকটা ঘোড়ায় চড়ে এবং বাকিটা পায়ে হেঁটে, তবে এখানে পৌঁছানো যেত।

হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজ খুব জটিল না হলেও বেশ শ্রমসাধ্য ছিল। সকালবেলা খেয়ে উঠেই তাঁরা গুহায় গুহায় ঘুরে রোগীদের দেখাশুনো করতেন, ওষুধ-পথ্যের বিধান দিতেন। অস্ত্রোপচার হ'ত দুপুর বেলায়, কারণ যে গুহায় অস্ত্রোপচার করা হ'ত, সেখানে শুধু দুপুর বেলাতেই উপযুক্ত আলো পাওয়া যেত। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁরা একটু অবকাশ পেতেন। ডাক্তারী বই, রাজনীতির বই, সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি প'ড়ে তাঁরা এই সময়টা কাজে লাগতেন। বিকালে আবার হাসপাতালে কাজের পালা। এ বেলা তাঁরা বাইরের রোগীদের দেখতেন। হাসপাতালের এই বহির্বিভাগটি শীগগিরই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল ; বহুদূর থেকে দলে দলে লোক আসত ভারতীয় ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্য।

ইয়েনানের মেডিকাল কলেজটি গোড়ায় ছিল একটি মেডিকাল স্কুল—অল্পদিন আগে এটি কলেজে উন্নীত হয়েছিল। চীনের লালফৌজ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ চালাচ্ছিল, সেই সময় এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। কম্যুনিস্টরা

যখন বিখ্যাত "ছ'হাজার মাইলের মার্চ" ক'রে কিআংসি থেকে শেন্‌সি পর্যন্ত যেতে বাধ্য হয়, সে সময় এই স্কুলটিও তাদের সঙ্গে ছিল। যে এগার মাস কম্যুনিস্ট-বাহিনীকে পথ চলতে হয়েছিল, সে সময় এই ভ্রাম্যমান স্কুলটিতে রীতিমত পড়াশুনো চলত ; এমন কি, এরই মধ্যে ছু'দল ছাত্র স্কুল থেকে পাশ করে বেরোয়।

* * * *

ইয়েনানের মত জায়গা চোখে দেখা দূরে থাক, এ রকম জায়গার কথা তাঁরা গল্পেও শোনেন নি। আদত ইয়েনানের ওপর এতবার বোমা পড়েছিল যে সহরের মধ্যে একটি বাড়ীও আস্ত ছিল না। সহরে জনপ্রাণীর চিহ্ন ছিল না সবাই সহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল ; তবু জাপানী বিমানবহর ইয়েনানের ধ্বংসস্তূপের ওপরই অনবরত হানা দিয়ে অযথা অজস্র দামী বোমা নষ্ট করত। এ যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে শক্তিক্ষয় করা। একবার জাপানী বিমান থেকে কয়েক শ'টন বোমা পড়বার ফলে মরেছিল শুধু একটি গাধা!

বিধ্বস্ত ইয়েনানের আশেপাশে পাহাড়ের গা কেটে অনেক গুহা তৈরী করা হয়েছিল। পাহাড়ের ঝুঁকে-পড়া চূড়ার নীচে কিংবা ছু'টি খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে কয়েকটি পাকা বাড়ীও গাঁথা হয়েছিল। এর চেয়ে অদ্ভূত রাজধানী যে পৃথিবীর আর কোথাও নেই, এ-কথা জোর ক'রে বলা যায়। এরই মধ্যে প্রায় চল্লিশ

হাজার লোক বাস করত। জাপানী সেনাবাহিনীকে ব্যতি-ব্যস্ত করবার জন্য এখান থেকে 'গেরিলা'-দল বেরোত। অষ্টম পন্থা বাহিনীর যুদ্ধ-পরিচালনার কেন্দ্রও ছিল এখানে। উত্তর-চীনের যে অঞ্চল তখন "গেরিলা-সামাজ্য" নামে পরিচিত ছিল, তার রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রও এই ইয়েনানেই ছিল। সীমান্ত অঞ্চলের কতকগুলি অল্প-বিস্তর স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে এই "গেরিলা-সাম্রাজ্য" গ'ড়ে উঠেছিল।

'সীমান্ত অঞ্চল' বলতে কি বোঝায়? এডগার স্নো লিখেছেন: "এই অদ্বিতীয় ব্যবস্থার মূলে কতকটা আছে উত্তর-চীনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আর কতকটা আছে চীনের যুদ্ধকালীন অবস্থা।"* 'সিআনের ঘটনায়' কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের মিলন হবার আগে এই অঞ্চলে সোভিয়েট আদর্শে পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল। মিলনের সর্তানুযায়ী কম্যুনিস্টদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লুপ্ত হয়ে এ অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে ফিরে গেল। কিন্তু 'লাল ফৌজের' ('অষ্টম পন্থা বাহিনী' নামে এ ফৌজ কেন্দ্রীয় সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) হাতেই শেন্‌সি, কান্‌সু এবং নিংসিয়া প্রদেশের শাসনভার রইল। এই তিনটি প্রদেশে 'শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংসিয়া সীমান্ত রাষ্ট্র' নামে একটি নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নয়—প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতি-

* *"Battle for Asia"*

ষ্ঠানের ভিত্তিতে একটি গণতন্ত্ররূপে এটি গড়ে উঠেছিল। এখানকার নেতারা প্রায় সবাই কম্যুনিস্ট; কিন্তু বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখবার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে যে, স্থানীয় গণপরিষদের (পার্লামেণ্টের) সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ হবে কম্যুনিস্ট, এক-তৃতীয়াংশ কুওমিনটাঙ্গের প্রতিনিধি, আর বাকি আসনগুলি থাকবে তাদের জন্য, যারা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নয়।

ইয়েনান এই রাষ্ট্রের রাজধানী; এর অধীনে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল আছে, তা আয়তনে প্রায় ইংলণ্ডের সমান। এই বিরাট রাষ্ট্রের অধিকাংশই তখন জাপানীদের কবলে। আশা ও আনন্দের কথা এই যে, জাপানীরা যে-সব অঞ্চল পুরোপুরি দখল করেছে বলে সারা পৃথিবীতে ঘোষণা করছিল, সে সব অঞ্চলেও তাদর প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সেনানিবাস সমন্বিত গ্রামে ও নগরে এবং বহু-প্রহরী-পরিবৃত রেলপথগুলিতে। জাপানী সেনারা সে সব অঞ্চল জয় করেছিল বটে, কিন্তু সেখানে তখনও 'সীমান্ত সরকারের' আধিপত্য অক্ষুণ্ণ—জনসাধারণও এই সরকারের শাসনই মানত।

শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংসিয়া ছাড়া 'গেরিলা'-অঞ্চলে আরও কয়েকটি 'সীমান্ত-রাষ্ট্র' ছিল। এই তিনটি প্রদেশের আশে-পাশে 'শান্‌সি-হোপেই-চাহার' অঞ্চলকে শত্রুদের এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থার হাত থেকে পুনরধিকার করেছিল অষ্টম পন্থা বাহিনী। এ ছাড়া উত্তর-শানটুঙ্

প্রদেশে আরও একটি 'সীমান্ত-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; এটিও জাপানীদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই সব অঞ্চলে ইয়েনানের প্রভাবে যে শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা মুখ্যতঃ গণতান্ত্রিক এবং কতকটা সমাজতান্ত্রিক। এ রকম শাসনবিধির উদ্দেশ্য ছিল জাপানীদের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃ-প্রবৃত্ত প্রতিরোধ-শক্তিকে সংহত করা।

* * * *

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী মাও ৎসে-তুঙ্ 'লাল' চীনের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী নেতা। তিনি আগে উত্তর-চীনে 'সোভিয়েট'-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ডাক্তাররা ইয়েনানে আসবার আগেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন, বইয়েও অনেক কথা পড়েছিলেন। তাই এসেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁরা উৎসুক হয়ে উঠলেন। ইয়েনানে আসবার পরদিন তাঁদের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সভা হয়েছিল, সেই সভায় অন্যান্য কম্যুনিস্ট নেতার সঙ্গে মাও ৎসে-তুঙ্ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পরনে সাধারণ সৈনিকের উর্দি ছিল বলে ডাক্তাররা প্রথমটা তাঁকে চিনতে পারেন নি। পরে সভাস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন তাঁকে চিনিয়ে দিল। ছিপছিপে, রোদে-পোড়া জলে-ভেজা গোছের চেহারার একমাত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর দৈর্ঘ্য। উপস্থিত চীনাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন দীর্ঘতম।*

*এড্গার স্নো তাঁর এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন: "সাধারণ চীনাদের চেয়ে তিনি অনেক

কয়েক দিন পরে বোমাবিধ্বস্ত ইয়েনান সহরে মাও ৎসে-তুঙের সঙ্গে তাঁদের আবার দেখা হ'ল। যে ঘরে তিনি তখন থাকতেন, সমস্ত ইয়েনান সহরের মধ্যে শুধু সেই ঘরটিই আশ্চর্য ভাবে জাপানী বোমার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এই ঘরে তিনি অভ্যাগতদের সঙ্গে দেখা করতেন। খানকতক সাধারণ ধরণের চেয়ার আর নড়বড়ে টেবিল ছাড়া সে ঘরে আর কোন আসবাব নেই। মাও ৎসে-তুঙ্ হাসিমুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের কথাবার্তা চলল দোভাষীর মারফৎ। ভারতবর্ষ ও ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর খুব আগ্রহ দেখা গেল। কংগ্রেস, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলালের সম্বন্ধে তিনি তাঁদের অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। জাপানী কবি নগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ তখন বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল। এই সব পত্রে জাপ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারী রূপকে যথাযথভাবে উদ্ঘাটিত ক'রে ঋষি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এরই জন্য জাপানের ওপর ভারতবর্ষের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকা সম্ভব নয়। এই পত্রালাপ সম্বলিত কয়েকখানা সংবাদপত্র তাঁরা মাও ৎসে-তুঙকে দিলেন। তিনি ইংরাজি না বললেও

বেশী লম্বা—অনেকটা আব্রাহাম লিঙ্কনের মত। একটু কুঁজো, মাথায় লম্বা কালো চুল, চোখ দু'টি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল, নাসিকা উন্নত এবং কপোলাস্থি পরিস্ফুট······মুখে বুদ্ধি ও অসাধারণ চাতুর্যের ভাব।" (*Red Star Over China*).

পড়তে খানিকটা পারেন।

মাও ৎসে-তুঙ একদিন ভারতীয় ডাক্তারদের খেতে বললেন—খুবই সাদাসিধে ধরণের খাওয়া তাঁর। খাবার আসরে নানারকম হাসির গল্প ব'লে তিনি অতিথিদের বিশেষ আনন্দ বিধান করলেন। তিনি খুব বেশী মশলা দেওয়া খাবার ভালবাসেন—তা ছাড়া মাংস এবং তরিতরকারীতে মেশাবার জন্য লঙ্কার গুড়ো তাঁর টেবিলে সব সময়ই থাকে। স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সাথে তিনি মন্তব্য করলেন, লঙ্কার ঝালের প্রতি অনুরাগ চীন ও ভারতের একটি যোগসূত্র!

এর পর অনেকবার তাঁর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সরলতা ও সহজ রসবোধ তাঁদের মুগ্ধ করেছে। একবার ঘোড়া থেকে প'ড়ে ডাঃ অটলের পাঁজরার হাড় ভেঙ্গে যায়: এর কয়েকদিন পরেই বৃষ্টির সময় ঘোড়ার পা পিছলে যাওয়ায় ডাঃ বসুও ঘোড়া থেকে পড়ে যান। এই ঘটনার পর মাও ৎসে-তুঙ নিজের পা ছু'টি দেখিয়ে তাঁদের বললেন, "ঘোড়া হিসেবে এদের জুড়ি নেই। যেখানে দরকার, এরা আমাকে ঠিক নিয়ে যাবে, অথচ পড়ে যাবার কোন ভয়ই নেই।"

* * * *

আগস্ট মাসে (১৯৩৯) পণ্ডিত জওহরলাল তার ক'রে জানালেন যে তিনি সে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে চীনে আসবেন। এও জানালেন যে ইয়েনানে যেয়ে কার্যরত ভারতীয় ইউনিট

এবং সেই সঙ্গে মাও ৎসে-তুঙ এবং চু তে'র সঙ্গে দেখা করবার তাঁর বিশেষ ইচ্ছা আছে। এ খবরে তাঁরা খুবই আনন্দিত হলেন।

শুধু তাঁরা কেন, ইয়েনানের সবাই এ খবরে আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়ে উঠল। একটি আলাদা গুহা চূণকাম ক'রে পণ্ডিতজীর জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী ক'রে রাখা হ'ল। ডাঃ মুখার্জি তখন অস্ত্রোপচারের জন্য হংকংয়ে যাচ্ছিলেন। পথে চুংকিঙে পণ্ডিতজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল।* জওহরলাল বিমানযোগে ইয়েনানে রওনাও হয়েছিলেন, কিন্তু চেঙ-তু পর্যন্ত এসেই তিনি খবর পেলেন, ইয়ুরোপে যুদ্ধ বেধেছে, তাই তাঁকে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হবে। তাঁর এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনে ইয়েনানের সবাই অত্যন্ত নিরাশ হ'ল।

ডাক্তারদের আজও মনে পড়ে, ইয়ুরোপে যুদ্ধ বাধবার ছ'দিনের মধ্যে তাঁরা সে সম্বন্ধে কোন খবর পান নি। পয়লা সেপ্টেম্বর হিটলারের সেনাবাহিনী পোলাণ্ডের সীমানা অতিক্রম করে, কিন্তু ইয়েনান থেকে লোকের মুখে তাঁদের

*"নদীবক্ষে একটি বালুচরের ওপর আমার এরোপ্লেন নামল। ডাঃ চু এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। ডাঃ চু আগেই আমাকে বেতারযোগে খবর দিয়েছিলেন। নামবার সময় "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের চিরপরিচিত সুমধুর সুর কাণে এল। অবাক হয়ে তাকাতেই চোখ পড়ল সামরিক পোষাক পরা একজন ভারতীয়ের ওপর। তিনি আমাদের কংগ্রেস মেডিকাল ইউনিটের ডাঃ মুখার্জি"

—জওহরলাল নেহরু (*China, Spain and War*).

হাসপাতালে খবর পৌঁছাল সাতই সেপ্টেম্বর।

এই সময় এড্‌গার স্নো ইয়েনানে আসেন। মাও ৎসে-তুঙের প্রদত্ত এক ভোজের আসরে তাঁর সঙ্গে ডাক্তারদের আলাপ হ'ল। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কুওমিন্‌টাঙের কয়েকজন সেনাপতি এবং কয়েক জন রুশ পরামর্শদাতা। যুদ্ধ সম্বন্ধেই আলাপ আলোচনা হ'ল। মাও ৎসে-তুঙ বললেন, তিনি রেডিওর মারফৎ খবর পেয়েছেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বৃটেনের সমরনীতির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী করেছে এবং জানতে চেয়েছে, সেই নীতির সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার কি সম্পর্ক আছে।

* * * *

ইয়েনানে তাঁরা যে সব প্রতিষ্ঠান দেখলেন, তার মধ্যে জাপ-বিরোধী বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সহর থেকে কয়েক মাইল দূরে কতকগুলি গুহার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত—ছাত্ররা নিজেরাই এই গুহাগুলি কেটে নিয়েছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'হাজার ছাত্র ছিল। তা ছাড়া, অন্যান্য সীমান্ত-অঞ্চলে এর শাখাগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল আট হাজার। গোড়ায় চীনা-সোভিয়েটের আমলে এর নাম ছিল "লাল শিক্ষালয়" (Red Academy); তখন এখানে পার্টির সভ্যদের কম্যুনিজমের আদর্শও মতবাদ শেখান হ'ত। এখন এর পুরো নাম "জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়।" ছাত্রদের এখানে রাজনীতি

ও যুদ্ধবিদ্যায় ছয়মাসব্যাপী পরিপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়। যারা রাজনীতি বিভাগের ছাত্র, তাদরও যুদ্ধনীতি ও সামরিক সংগঠন সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞানলাভ করতে হয়, আর সামরিক বিভাগের ছাত্রদেরও খানিকটা রাজনীতি শিখতে হয়। এখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্ররা অষ্টম পন্থা বাহিনীতে নিযুক্ত হয়। যারা সমরনীতির ছাত্র, তারা হয় সেনা-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী আর রাজনীতির ছাত্ররা পায় 'পলিটিক্যাল কমিশারের' পদ।

চীনের সব জায়গা থেকে দলে দলে ছাত্র আসত এই অসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে পৌঁছুবার জন্য অনেককে শত শত মাইল হাঁটতে হ'ত। অনেকে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যময় গৃহজীবন ত্যাগ ক'রে, পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসত। শুধু ছাত্র নয়, বামপন্থী শিল্পী, সাহিত্যিক ও বিদ্বান বক্তিরাও ইয়েনানে এসে এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধতর করেছিলেন।

এই সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি প্রমাণ পাওয়া যায় এখানকার গণনাট্য আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতিতে। চীনের চিরাগত নাট্যরীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও এই গণনাট্য প্রগতি-শীল, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং ভাবপ্রচারের সহায়। ইয়েনানে ডাক্তাররা অনেকগুলি গণনাট্যের অভিনয় দেখেন। এর মধ্যে একটি নাটক ছিল তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে। তাঁদের ইয়েনানে আসবার পরদিনই ছাত্ররা এই নাটকটির অভিনয়

করে। ভারতীয় ডাক্তাররা কেমন ক'রে চীনা মার্সদের সঙ্গে একযোগে কাজ ক'রে রণাঙ্গণে আহত চীনা সৈন্যদের প্রাণরক্ষা করছেন, এই ছিল নাটকটির বিষয়বস্তু। ডাক্তারদের ভূমিকায় যারা অভিনয় করছিল, তাদের সবারই লম্বা কালো দাড়ি দেখে আসল ডাক্তাররা বেশ একটু কৌতুক বোধ করলেন। সাংহাই, টিয়েন্‌ৎসিন্, ক্যান্টন ও হ্যাঙ্কাউয়ের বৃটিশ বসতিসমূহে যে সব শিখ পাহারাওয়ালা ও পুলিশ আছে, সাধারণ চীনারা ভারতীয় বলতে তাদেরই বোঝে, কারণ অন্য ভারতীয়দের দেখবার সুযোগ তাদের বড় একটা হয় না।

ইয়েনানে রোজই সন্ধ্যেবেলায় একটা না একটা উৎসব লেগেই থাকত। একদিন তাঁরা স্কুলের ছেলেদের "সহ-যোগিতা-নৃত্য" দেখলেন। ছেলেদের কতক পরেছিল লাল পোষাক (কম্যুনিস্টদের প্রতীক) আর বাকি সবার পরণে ছিল নীল পোষাক (কুওমিনটাঙ্গের প্রতীক)। আর একটি নাচের বিষয় ছিল "ভারতীয় বন্ধুদের প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণ"। এদের নাচের ভঙ্গী চীনা ও ইয়ুরোপায় পদ্ধতির মিশ্রণজাত—ভারতীয় নৃত্যের ছন্দ ও গতিবিলাস এতে নেই। কিন্তু, জনগণকে রাজনৈতিক চেতনা দেবার জন্য কি ক'রে চারু-কলার সাহায্য নেওয়া যায়, তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল এদের এই সব নাচ। পুরোনো ধরণের 'পীপিং-অপেরা'কে পর্যন্ত নূতন রূপ দিয়ে জাপ-বিরোধী প্রচারকার্যে লাগানো হয়েছে।

এই সব অপেরার মধ্য দিয়ে চীনের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বীরদের দেশপ্রেমের গৌরবময় কাহিনী প্রচার করা হয়।

অষ্টম পন্থা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কতগুলি "নাট্য-বাহিনী" (Drama Squads) আছে। সৈন্যদের কাছে এবং গ্রামের চাষীদের কাছে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকের অভিনয় ক'রে এরা তাদের মনোবল ও প্রতিরোধশক্তিকে সজাগ রাখে।

* * * *

ইয়েনানের টুকিটাকি খবরঃ—

একবার ঘোড়ার পিঠ থেকে প'ড়ে যেয়ে জেনারেল চোউ এন্-লাইয়ের ডান হাত ভেঙ্গে যায়। তিনি ভারতীয় ডাক্তারদের ডেকে পাঠান, কারণ অন্য কোন ডাক্তারেরা চিকিৎসাধীনে থাকতে তিনি রাজী ছিলেন না। তাঁর গুহায় এসে ডাক্তাররা দেখেন, তিনি বাঁ হাতে লিখতে শিখবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

ইয়েনানে পুরুষ মেয়ের তফাৎ বোঝা শক্ত, কারণ সেখানে প্রায় সবাই একই ধরণের সামরিক পোষাক পরে।

ডাক্তাররা যতদিন ইয়েনানে ছিলেন, তার মধ্যে অনেক বার সেখানে বিমান-আক্রমণ হয়েছিল। অনেক সময় তাঁরা নিজেদের গুহা থেকে দেখতে পেতেন, জাপানীরা ইয়েনানের জনহীন ধ্বংসস্তূপের ওপর বোমা ফেলছে। এর মধ্যে কতকগুলি বোমা মোটে ফাটতই না। কর্মকারদের কো-অপারেটিভের শ্রমিকরা এই সব বোমার ভেতর থেকে ধাতু এবং রাসায়নিক উপাদান বার ক'রে নিত।

ডাঃ অটলের অনেক গুণের একটি হ'ল তাঁর রন্ধন-নৈপুণ্য। তিনি প্রায়ই নিজের গুহায় নানারকম ভারতীয় খাবার রান্না করতেন। তাঁর রান্নার সুখ্যাতি চারিদিকে এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে বহুদূর থেকে লোক এসে তাঁর কাছে ভারতীয় খানা খেতে চাইত।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে পথ ভুল ক'রে তাঁরা একটি গ্রামে প্রবেশ করেন। গ্রামে ঢুকতেই বর্শা, তলোয়ার, সেকেলে ধরণের বন্দুক ইত্যাদি হাতে একদল লোক চিৎকার করতে করতে তাঁদের দিকে এগিয়ে এল। ব্যাপার দেখে তাঁরা তো অবাক্! তারা তাঁদের "গ্রেপ্তার" ক'রে গ্রামের ভেতর নিয়ে গেল। সেখানে তাঁদের চা খাওয়ান হ'ল। তারপর হেড্ কোয়ার্টারে ফোন ক'রে, তাঁদের পরিচয় পেয়ে, তবে তারা তাঁদের ছেড়ে দিল। পরে তাঁরা জানতে পারেন, সে-গ্রামের "আত্মরক্ষা বাহিনী" তাঁদের গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁদের পরণে দামী পোষাক দেখে তারা ভেবেছিল যে তাঁরা হয় জাপানী আর না হয় জাপানীদের গোয়েন্দা। স্থানীয় ভিত্তিতে জাতীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য এই সব "আত্মরক্ষা বাহিনী" গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসীরা জাপানীদের প্রতিরোধ করবার জন্য এমনি ক'রে নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে। এই জন্যই জাপানের পক্ষে চীন অধিকার করবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বরঞ্চ উত্তর-চীনের যে-সব অঞ্চল তাদের হাতে এসেছিল, সেগুলিও চীনা গেরিলা-বাহিনী একে একে পুনরধিকার করছিল।

গেরিলাদের নৈশ অভিযান

"আমরা কিসের জন্য লড়ছি ?"
"দেশরক্ষার জন্য।"
"আমাদের দেশ কতদিনের ?"
"চার হাজার বছরের।"
"আমাদের সংগ্রাম কিসের বিরুদ্ধে ?"
"জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।"
"শত্রুরা যখন পিছু হটবে, তখন আমরা কি করব ?"
"আক্রমণ করব।"
"আক্রমণ করব আমরা কখন এবং কি-ভাবে ?"
"সংখ্যায় যখন আমরা বেশী তখন এবং অতর্কিতভাবে।"
"আমাদের শ্রেষ্ঠ নীতি কি ?"
"জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করা।"

—চীনা গেরিলাদের প্রশ্নোত্তর (লিন্ ইউটাঙ্গের উপন্যাস 'A Leaf in the Storm'এ উদ্ধৃত)।

ডাঃ চোলকার এবং ডাঃ মুখার্জি আগেই ভারতবর্ষে ফিরেছিলেন ; তাই অষ্টম পন্থা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল চু তে'র আহ্বানে ভারতীয় ডাক্তাররা যখন তাঁর হেড্‌কোয়ার্টারে রওনা হলেন, তখন সংখ্যায় তাঁরা মাত্র তিন জন। জেনারেল চু তে'র হেড্‌কোয়ার্টার তখন দক্ষিণ-পূর্ব শানসিতে উসিয়াঙের কাছে একটি গ্রামে অবস্থিত। সেই রণাঙ্গণে চীনা বাহিনীর অনেকে হতাহত হয়েছিল, তাই ডাক্তার এবং ওষুধপত্রের দরকার ছিল সেখানে জরুরী।

ইয়েনান থেকে যাত্রা করবার আগে ডাঃ অটল, কোট্‌নিস্

ও বসুকে খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে তাঁদের যাত্রাপথ খুবই বিপদ্-সঙ্কুল, কারণ পথে একাধিকবার তাঁদের শত্রুসেনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তবু তাঁরা নির্ভীক অন্তরে যাত্রা করলেন। চীনা দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে নিবিড় একাত্মবোধ ছিল ব'লেই তাঁরা তাদের সঙ্গে যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত ছিলেন। ইতিমধ্যে চীনা ভাষায় তাঁদের বেশ দখল হয়েছে—অটল এবং বসুর চেয়ে কোট্‌নিস্ আরও তাড়াতাড়ি চীনা বলতে শিখেছেন। তাই নিজেদের তাঁরা আর বিদেশী ব'লে ভাবতেন না। চীনা নাম নিয়ে তাঁরা তখন বস্তুতঃ চীনের নাগরিক হয়ে উঠেছেন। তাঁরা তখন আন্ তে হুআ, খো তে হুআ এবং বা স্‌সু হুআ—চীনের প্রতিরোধী বাহিনীর পুরোভাগে অবস্থিত তিনজন চিকিৎসক।

ইয়েনান থেকে উসিয়াঙ পূব-বরাবর প্রায় তিনশ মাইল দূরে। সাধারণ অবস্থায় এ পথ অতিক্রম করতে এক সপ্তাহের বেশী লাগে না—কিন্তু তাঁদের লেগেছিল ছ'সপ্তাহেরও বেশী। এর কারণ, জাপানী-অধিকৃত অঞ্চল এড়িয়ে যাবার জন্য তাঁদের খুব আঁকাবাঁকা, ঘোরালো পথে যেতে হয়েছিল। প্রথমে তাঁরা গেলেন দক্ষিণে সিআন্ পর্যন্ত, সেখান থেকে পূবে, তারপর গেলেন উত্তরে। এমনি ক'রে সরল রেখা ধ'রে না যেয়ে তাঁদের যেতে হ'ল একটি বিষম-চতুর্ভুজের তিন বাহু দিয়ে ঘুরে।

যাই হোক, যাত্রাপথ তাঁদের বেশ রোমাঞ্চকর ছিল। ইয়েনান থেকে বেরোবার সময় তাঁদের সঙ্গে নানা রকমের সহযাত্রী জুটেছিল। মূলার নামে একজন নাৎসি-বিরোধী জার্মান ডাক্তার তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ; আর ছিল একজন চীনা সেনাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে দু'জন জাপানী যুদ্ধবন্দী। এ ছাড়া সশস্ত্র রক্ষী হিসেবে অষ্টম পন্থা বাহিনীর বিশজন সৈন্যও তাঁদের সঙ্গে ছিল। জাপানী বন্দী দু'জনের পায়ে শিকল বা হাতে হাতকড়া ছিল না। রক্ষীরা তাদের ওপর কড়া নজর রাখত বটে, কিন্তু এক পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর সব কিছুই করবার স্বাধীনতা তাদের ছিল। তাঁরা দেখে আশ্চর্য হলেন যে জাপানী জঙ্গীবাদের এই দু'জন সমর্থক এই যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কিছুই জানে না। তারা শুধু জানে, সম্রাটের আদেশে তারা চীনাদের সঙ্গে লড়ছে।

ইয়েনান থেকে সিআন পর্যন্ত তাঁরা গেলেন মোটরে, সেখান থেকে রেলগাড়ীতে ক'রে পূবদিকে রওনা হলেন। সিআনে কয়েকজন ফ্যাসি-বিরোধী অস্ট্রিয়ান ও চেক্ ডাক্তারের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'ল। এঁরা স্পেনে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে কাজ করেছিলেন ; এখন অষ্টম পন্থা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এসেছেন। সিআনেই তাঁরা ক্যানাডিয়ান অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ বেথুনের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পেলেন। ডাঃ বেথুন গেরিলা

বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতেন। একটি জরুরী অস্ত্রোপচার করবার সময় তাঁকে রবারের দস্তানার অভাবে খালি হাতেই কাজ করতে হয়, ফলে তাঁর একটি আঙ্গুলে আঁচড় লেগে বিষাক্ত ঘা হয় এবং রক্ত দূষিত হয়ে তিনি মারা যান। ডাঃ বেথুন ছিলেন একজন নির্ভীক মানব-প্রেমিক। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবাই ছিল তাঁর ধর্ম। অষ্টম পন্থা বাহিনী থেকে তাঁর উদ্দেশ্য একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হচ্ছিল।

সিআন থেকে রেলে ক'রে তুঙ্‌কোয়ান্ পর্যন্ত যেয়ে তাঁরা শুনলেন যে জাপানীরা খুব কাছে এসে পড়েছে ব'লে সেখান থেকে রেল চলাচল বন্ধ আছে। কারণ জাপানীরা যদি রেলগাড়ীগুলি দখল না-ও করে, তবু তারা চলন্ত ট্রেনের ওপর গোলাবর্ষণ করতে পারে, এমন আশঙ্কা ছিল। কাজেই ব্যবস্থা হ'ল, তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের পিছন দিয়ে আশি মাইল ঘুরে ওয়ান্‌সিয়াঙে যাবেন। সেখান থেকে রেলগাড়ীতে বাকি পথ যাওয়া চলবে। ঘোড়াগুলি আবার এমনি ঢিমে-তেতালা চালে চলতে লাগল যে ওয়ানসিয়াঙে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। গম-বোঝাই একটি মাল-গাড়ীতে তাঁরা সে-রাত কাটালেন। তাঁরা এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে মাইল বারোর মধ্যেই জাপানী সেনানিবাস রয়েছে, এ চিন্তাতেও তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হ'ল না। সকালে উঠে দেখেন, তাঁদের সমস্ত শরীর গমে ছেয়ে গেছে। তাঁদের

ঘুমের মধ্যে মালগাড়ীখানাকে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; তারই ঝাঁকুনিতে যত রাজ্যের গম পড়েছিল তাঁদের গায়ের ওপর।

পরদিন কুয়াসা, বৃষ্টি এবং এবং তুষারপাতের মধ্যে তাঁদের গাড়ী মিয়েঞ্চিতে পৌঁছাল। এখানে তাঁদের সেই গম-বোঝাই গরম মালগাড়ী থেকে নেমে যেতে হ'ল। হিমবিন্দুর চেয়েও বেশী শীতের মধ্যে তাঁদের পায়ে হাঁটার পালা স্থরু হ'ল। ইচাঙে তাঁরা শীত সইবার যে অভ্যাস করেছিলেন, সেই অভ্যাস এবার কাজে এল। অশ্বতরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা উৎরাই ভেঙ্গে উঠতে লাগলেন। এই অঞ্চলে অষ্টম পন্থা বাহিনীর সংবাদ আদান-প্রদানের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। কয়েক মাইল পর পরই পনের-বিশ জন সৈন্য নিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। এদের মারফৎ অষ্টম পন্থা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট পরস্পরের সঙ্গে এবং হেড্ কোয়ার্টারের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখত। এ ছাড়া এ অঞ্চলে যে সব 'গেরিলা'-বাহিনী ছিল, তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখবার উপায়ও ছিল এই ঘাঁটিগুলি।

মিয়েঞ্চি থেকে বেরিয়ে তাঁরা খেয়া নৌকায় পীতনদী পার হলেন। পরপারে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ল—একটি অত্যন্ত করুণ ও শোচনীয়, আর একটি গভীর প্রেরণাপূর্ণ।

চীনা জাতীয় বাহিনীর একদল আহত সৈন্য শিবির-হাসপাতালের দিকে চলেছিল। সে এক করুণ দৃশ্য! এক বছর আগে হ্যাঙ্কাউয়ের কাছে 'নরকের রাজপথে' ডাক্তাররা যে সব আহত সৈন্যকে দেখেছিলেন, এরাও তাদেরই মত শীর্ণকায়, জীর্ণবস্ত্রপরিহিত, অনশনপীড়িত। পথের পাশে একটি জরুরী চিকিৎসা-কেন্দ্র খুলে তাঁরা এদের চিকিৎসা করতে লাগলেন। জাপানীদের হাত থেকে যে সব গ্রাম সদ্য পুনরধিকৃত হয়েছিল, সে সব গ্রামে তাদের নির্বিচার অমানুষিক অত্যাচারের যে চিহ্ন তাঁরা দেখলেন তা আরও মর্মন্তুদ। জাপানীরা সে সব জায়গার বাড়ী-ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে। অধিবাসীদের অনেককে তারা গুলি ক'রে মেরেছে, বাকি সবাই প্রাণভয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেছে। গ্রামের প্রান্তরে মানুষের অস্থি-কঙ্কাল ছড়ানো। এক এক জায়গায় দলে দলে চীনা চাষীকে গুলি ক'রে মারা হয়েছিল—সে সব জায়গায় তখনও মেশিনগানের গুলির দাগ রয়েছে।

রণাঙ্গণ থেকে প্রত্যাবৃত্ত জন তিরিশেক ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গেও তাঁদের এখানেই দেখা হ'ল। এরা অষ্টম পন্থা বাহিনীর প্রচার বিভাগে কাজ করে। বয়স এদের সবারই আঠার থেকে পঁচিশের মধ্যে। এদের সঙ্গে ছিল বহন-যোগ্য অভিনয়ের সাজ সরঞ্জাম, কতগুলি সাদাসিধে বাদ্যযন্ত্র —যেমন ড্রাম, মাউথ অর্গান, একতারা জাতীয় তারের

যন্ত্র—রাত্রে অভিনয় করবার জন্য গ্যাসের আলো আর সাজপোষাকের একটি বড় বাক্স। এই সব জিনিস এবং নিজেদের বিছানাপত্র এরা নিজেরাই বহন করে। তিন মাস পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে অভিনয় ক'রে এরা ফিরছিল। অবসন্ন হয়ে পড়লেও এদের বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

পীতনদীর তীরে একটি গ্রামে তাঁরা এদের অভিনয় দেখলেন। দর্শকসংখ্যা ছিল প্রায় তিনশ। একটি বৌদ্ধ মন্দিরে অভিনয়ের ব্যবস্থা হ'ল—দর্শকরা বসল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। ভারতীয় মেডিকাল ইউনিটের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য অভিনেতারা একটি রূপক-নাট্যের মধ্য দিয়ে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা-সমরে চীন-ভারতের ঐক্যের কথা ফুটিয়ে তুলল। ডাক্তাররা দেখে অবাক হলেন যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ছাত্র-শিল্পীরা নাটকটি লিখে, মহড়া দিয়ে, অভিনয় করল। অভিনয়ের মধ্যে গান এবং বক্তৃতা ছাড়াও ছিল সংবাদ-পরিবেশনের চমৎকার ব্যবস্থা। শত্রুসেনার পরাজয় সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নূতন সংবাদগুলিকে প্রথমে কবিতার আকারে আবৃত্তি করা হ'ল—তারপর সেগুলিকে গানের সুরে গাওয়া হ'ল ড্রাম বাজিয়ে। অভিনয়ের প্রতিটি অংশেই দর্শকরা যে রকম প্রশংসা-মুখর হয়ে উঠল, তাতে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ হ'ল যে এই ধরণের অভিনয় গ্রামবাসীরা খুব পছন্দ করে। আদর্শ-প্রচারের দিক দিয়েও এর দাম যথেষ্ট।

জেনারেল চু তে'র হেড্‌কোয়ার্টারে যাবার উদ্দেশ্যে উত্তর দিকে অগ্রসর হবার সময় তাঁরা চীনা গেরিলাদের কার্যকলাপ দেখবার অনেক সুযোগ পেলেন। এক গ্রামে গেরিলা-নেতা থাং স-লিঙ্‌ এর সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'ল। যোদ্ধা বলতে সাধারণতঃ লোকে যা বোঝে, তার সঙ্গে এই বছর চল্লিশেক বয়সের লোকটির আকৃতিগত কোন সাদৃশ্য নেই, যদিও তাঁর পরণে জঙ্গী উর্দি এবং কোমরবন্ধে রিভলভার ছিল। দোভাষীর মারফৎ তিনি সারারাত ডাক্তারদের সঙ্গে আলাপ করলেন। আলাপের মধ্য দিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন যে থাং স-লিঙ্‌ ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় কৃষক। নিজের গ্রামের সমস্ত কৃষককে সামরিক শিক্ষা দিয়ে তিনি একটি 'গেরিলা'-বাহিনী গড়ে তোলেন। গোড়ায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না। তাই তারা জাপানী সেনানিবাস এবং অস্ত্রবাহী গাড়ীর ওপর অতর্কিত নৈশ আক্রমণ চালিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে। কেমন করে এই সব নৈশ অভিযানের পরিকল্পনা হ'ত, কেমন করে তাদের গোয়েন্দারা শত্রুসৈন্যের গতিবিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর জোগাড় করত, জাপানী বাহিনীকে ভুল পথে নিয়ে বিপন্ন করবার জন্য তারা কি ভাবে মোটর চলাচলের রাস্তা ধ্বংস ক'রে রাতারাতি নূতন রাস্তা তৈরী করত—এই সব কাহিনী তাঁরা থাং স-লিঙের মুখে শুনলেন।

ডাক্তারদের চড়বার জন্য কতগুলি খচ্চর দেওয়া হয়েছিল ;

কিন্তু এ অঞ্চলে শীতের প্রকোপ এত বেশী যে তাঁরা মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে শরীর গরম রাখতে বাধ্য হতেন। চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে পাহাড়ী পথে চলবার সময় তাঁরা একবার শুনতে পেলেন, খচ্চরগুলির খুরের ঘায়ে ঝন্ ঝন্ ক'রে শব্দ হচ্ছে। গোটাকতক পাথর তুলে নিয়ে তাঁরা দেখেন, সেগুলি অত্যন্ত ভারী। এর কারণ, এ সব পাহাড়ে রয়েছে নানারকম ধাতু, বিশেষতঃ লৌহপিণ্ড। অনেক সময় চাষীরা এখান থেকে ধাতুমিশ্রিত বড় বড় পাথরের টুকরো তুলে গ্রামের কামারশালায় নিয়ে যায় গালাবার জন্য। কয়লার তো অভাবই নেই এখানে। প্রত্যেক গ্রামেরই নিজস্ব কয়লার খনি আছে— কূয়োর মত ক'রে এই খনিগুলি কাটা। এ কয়লাও খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। লোকে বলে, শানসি প্রদেশের লোহা ও কয়লা একশ বছর ধ'রে সারা পৃথিবীর অভাব মেটাতে পারে।* তাই জাপানীরা এ অঞ্চল দখল করবার জন্য এত উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল, কিন্তু চীনা 'গেরিলা'-বাহিনী তাদের সে সাধে বাদ সেধেছে।

জেনারেল চু তে'র হেড্কোয়ার্টারে পৌঁছুবার আগে একদিন রাত্রিতে তাঁদের জাপানী ব্যূহের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে

---

* "China Builds for Democracy" র লেখক Nym Wales লিখেছেন, "চীনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভগুলি এখন (১৯৪৪) ব্যাপক ভাবে খনিজ উত্তোলন ও ধাতু গলানোর কাজে লেগেছে।"

নিতে হ'ল। এ ধরণের অভিযান কোন সময়েই সহজ নয়; কিন্তু অষ্টম পন্থা বাহিনী এবং চীনা গেরিলারা এর একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর উপায় বার করেছে। দিনের বেলা তাঁরা জাপানী সেনানিবাসের কাছাকাছি একটি গ্রামে বিশ্রাম করছিলেন। রাত্রিতে যে বিপদ্-সঙ্কুল পথে যেতে হবে, সেই সময় তাঁদের সেটা একবার দেখে নিতে বলা হ'ল। তাঁদের একটি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হ'ল; সেখানে শুয়ে নীচের উপত্যকা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। দূরবীণ দিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন, এই প্রশস্ত উপত্যকার মাঝখান দিয়ে সরু ফিতের মত একটি মোটর চলাচলের পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে। এ পথে জাপানীদের সমরবিভাগের অনেক গাড়ী তখন ছুটছিল। গেরিলারা তাঁদের দু'টি গ্রাম দেখাল—দু'টির মধ্যে মাইলখানেকের ব্যবধান। দু'টি গ্রামেই শত্রুদের সেনা-নিবাস ছিল। একটিতে ছিল পঞ্চাশ জন সৈন্য আর একটিতে দেড়শ। (এ সব খবর এনেছিল গেরিলাবাহিনীর গুপ্তচরেরা; শত্রুদের গতিবিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক খবর জানবার জন্য এরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে অনবরত শত্রুব্যূহের ভেতর দিয়ে আনাগোনা করে)। নীচে বহুদূর থেকে কামানের শব্দ আসছিল। পাহাড়ের 'খদের' পেছনে একটি চীনাবাহিনী ছিল—জাপানী সেনানিবাস থেকে তাদের লক্ষ্য ক'রে গোলা-বর্ষণ করা হচ্ছিল। এ ধরণের গোলাবর্ষণের যে কোন সার্থকতা নেই, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু

জাপানীদের রকম দেখে মনে হয়, তারা ভয় পেলেই কামান দাগতে সুরু করে।

ডাক্তারদের জানান হ'ল যে রাত্রিবেলা গেরিলারা বাইরের দিক থেকে জাপানীদের সেনানিবাস দু'টি আক্রমণ করবে। জাপানীরা যখন তাদের বাধা দিতে ব্যস্ত থাকবে, সেই সময় ডাক্তাররা সদলে দু'টি গ্রামের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন। পরিকল্পনাটি শুনতে তো খুবই ভাল, কিন্তু কাজে কতদূর কি হবে কে জানে!

রাতের অন্ধকারে গেরিলারা আঘাত হানে। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে তাদের অভিযান চালাতে হয়; তাই ঘোড়ায় চ'ড়ে যাওয়া তাদের বারণ, কারণ শক্ত জমিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ হয় খুব বেশী। কৃষক স্বেচ্ছাসেবীরা ডাক্তারদের মালপত্র এবং চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম বয়ে নিল। একশ কুড়িজন ক'রে গেরিলাদের দু'টি দল জাপ সেনানিবাস দু'টি আক্রমণ করবার জন্য তৈরী হ'ল। একদল যথারীতি রাইফেলে সজ্জিত ছিল; অন্য দলের সবাই সাধারণ চাষী; রীতিমত সামরিক শিক্ষা তারা তখনও পায়নি—তাদের হাতে ছিল হাতবোমা, বর্শা, শাবল, ছুতোর মিস্ত্রীর করাত; এও যাদের জোটেনি, তারা আসবার পথে গ্রাম থেকে যা কিছু পেয়েছে তাই হাতে ক'রে এনেছে। উপত্যকার পাদদেশে দাঁড়িয়ে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন, চাঁদ কখন অস্ত যায়। চারিদিক বরফে ছেয়ে গেছে, তাই তারার আলোতেও পথ

চিনে নিতে তাঁদের অসুবিধা হবে না। মধ্যরাত্রে আক্রমণ সুরু হবে, এই ছিল ব্যবস্থা। গেরিলাদের দল দু'টি আলাদা হয়ে গেল। শীগগিরই ডান বাঁ দু'দিক থেকে সমানে গুলির আওয়াজ কাণে আসতে লাগল, সেনাবাহিনীর ওপর গেরিলাদের হানা সুরু হয়ে গেছে! এই মুহূর্তের জন্যই তাঁরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। তড়িৎগতিতে তাঁরা দু'টি গ্রামের মধ্যবর্তী অনধিকৃত অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হ'লেন। সবাই নীরব, সবারই মনে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার একটা মিশ্রিত ভাব। 'শত্রুব্যূহ অতিক্রম করা!'—এটা এতদিন তাঁদের কাছে শুধু একটা কথার কথা ছিল। আশঙ্কা-উদ্বেগভরা এই ক'টি মুহূর্তে তাঁরা এর বাস্তব তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন।

তুষারাবৃত মোটর-চলাচলের পথ পার হয়ে তাঁরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হলেন। কিন্তু রোমাঞ্চকর অভিযানের বিপদ তখনও শেষ হয় নি। যে বুড়ো চাষীটি তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে ভয়ে অস্থির হয়ে পথ হারিয়ে ফেলল। সারারাত তাঁরা হাঁটছেন তো হাঁটছেনই; দু'টি পাহাড়ও তাঁদের ডিঙিয়ে যেতে হ'ল—কিন্তু তীব্র উত্তেজনা তখন তাঁদের পথশ্রমও ভুলিয়ে দিয়েছে।

পরদিন সকাল ন'টার সময় তাঁরা যখন রেজিমেণ্টের হেড্-কোয়ার্টারে পৌঁছালেন, তখন তাঁদের বিশ মাইল পথ হাঁটা হয়েছে! একটি মাটির কুটিরে যেই তাঁরা একটু হাত পা ছড়াবার জায়গা পেলেন, অমনি পুঞ্জীভূত ক্লান্তির বন্যা নেমে

এল তাঁদের দেহে।, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁরা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। সারাদিন তাঁরা সেই ভাবেই ঘুমিয়ে রইলেন। এর মধ্যে বিকেলে যে সে গ্রামের ওপর জাপানীরা তুমুল গোলাবর্ষণ করেছে এবং সবার ওপর যে নূতন ক'রে যাত্রা করবার আদেশ হয়েছে তাও তাঁরা জানতে পারেন নি।

চীনের নূতন প্রাচীর

"মানুষের স্বাধীনতার জন্য চীনে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর নাম অমর হয়ে রইল।"

—এড্‌গার স্নো (জেনারেল চু তে'র সম্বন্ধে লেখা)।

"আমরা যা শিখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই—নিজের যা সম্বল আছে, তারই সাহায্যে একটি জাতির সংগ্রাম জয়যুক্ত হ'তে পারে।"

—জেনারেল চু তে'।

উত্তর চীনের দক্ষিণ-পূর্ব শানসি অঞ্চলে উসিয়াঙের কাছে একটি অখ্যাতনামা গ্রামে কাদামাটির তৈরী একটি কুটির। বাইরে চাষীদের মেয়েরা গম পিষছে। একটু দূরে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ভারতীয় ডাক্তাররা জেন সঙ্গে দেখা করবার জন্য এই কুটিরের সামনে আসতেই বুড়ো-গোছের একটি লোক হাসিমুখে এগিয়ে এল তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে। লোকটির মাথাটা মস্ত বড়, বলি-চিহ্নিত মুখে সব-রকম আবহাওয়ার ছাপ, ঠোঁট দু'টি পুরু, পরণে একটু অপরিচ্ছন্ন সামরিক পোষাক। তাঁরা প্রথমে ভাবলেন, বুড়ো বোধ হয় জেনারেল চু তে'র আর্দালি-টার্দালি হবে। পরে তাঁরা জানতে পারলেন, এই লোকটি আর কেউ নয়, চু তে' স্বয়ং!

অষ্টম পন্থা বাহিনীর যিনি প্রধান সেনাপতি, তাঁর খাস-দপ্তর এই কৃষকের কুটিরে। ঘরের দেওয়ালগুলি উত্তর চীন,

চীন, এশিয়া এবং পৃথিবীর মানচিত্র দিয়ে ঢাকা—মানচিত্রগুলির ওপর নানারকম চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। ঘরের অর্দ্ধেকটা জুড়ে আছে একটা খাং * —অন্যান্য আসবাবের মধ্যে খানকয়েক চেয়ার, একখানা ছোট টেবিল আর একটি তেলের বাতি। এই অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে তাঁরা দেখলেন সেই জেনারেল চু তে'কে, যিনি তিন বছর ধরে উত্তর-চীনে জাপ অভিযানকারীদের অর্দ্ধেককে ঠেকিয়ে রেখেছেন। অষ্টম পন্থা বাহিনীর অপ্রচুর অস্ত্র-সজ্জার কথা ভাবলে এ ব্যাপারকে অতিপ্রাকৃত ব'লে মনে হয়।†

দোভাষীর মারফৎ চু তে'র সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁরা বুঝতে পারলেন, কেমন ক'রে এই অসম্ভবকে তিনি সম্ভব ক'রে তুলেছেন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামে গেরিলা যুদ্ধপ্রথার উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। শুধু পাহাড় পর্বতে নয়, সমভূমিতেও কেমন ক'রে গেরিলা অভিযান চালানো যায়, সে কথা তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা

---

* মাটির তৈরী শয্যাধার—এর নীচে ষ্টোভ জ্বালানো থাকে।

† "চু তে'র জীবনের বৈশিষ্ট্য এই : জমিদার বংশের ছেলে তিনি ; কিশোর বয়সেই তাঁর হাতে আসে ক্ষমতা—বিলাস-ব্যসন এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তবু প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে পৌঁছে তিনি অসামান্য ইচ্ছাশক্তির বলে আযৌবনের কলুষিত পরিবেশ ত্যাগ করেন এবং মাদকদ্রব্যের প্রতি আজীবনের আসক্তি থেকে মুক্ত হন। শেষে পারিবারিক জীবনের বন্ধন পর্যন্ত ছিন্ন ক'রে বৈপ্লবিক আদর্শের সেবায় তিনি নিজের সমস্ত সম্পদ্ উৎসর্গ করেন—কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন, সমসাময়িক কালের উচ্চতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই বৈপ্লবিক আদর্শকে প্রাণবান্ করেছে।"

—এড্গার স্নো (*Red Star Over China*).

করতে যেয়ে তিনি বললেন, "আমরা মানুষ দিয়েই পাহাড়ের কাজ চালাই।" গেরিলা-বাহিনী নিজেরা নিরাপদ থেকে অসতর্ক শত্রুদের প্রাণনাশ করবার জন্য কেমন কৌশলে গ্রাম-অঞ্চলে আঁকাবাঁকা গভীর পরিখা কেটে অভিযান চালায়, তার বিস্তারিত বর্ণনা তিনি তাঁদের কাছে করলেন।

মানুষ হিসেবে চু তে'র মধ্যে তাঁরা দেখলেন গভীর আন্তরিকতা এবং আবেগ, সেই সঙ্গে প্রশান্ত গাম্ভীর্য এবং ধৈর্য। চু তে'র সঙ্গে এরপরও অনেকবার তাঁদের দেখা হয়েছে, কিন্তু অতি অধস্তন সৈনিকের প্রতিও তাঁকে কখনও ক্রোধ প্রকাশ করতে বা ধৈর্য হারিয়ে অশিষ্ট ব্যবহার করতে তাঁরা দেখেন নি।

তাঁরা আসবার কয়েকদিন পরে, ১৯৪০ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে, তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্য এবং জেনারেল চু তে'র ষট্‌পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি পালন করবার জন্য একটি জনসভা হ'ল। চু তে' সেখানে অসামান্য বাগ্মিতার পরিচয় দিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—ভারত, চীন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের ভবিষ্যৎ।

চিকিৎসা-সংক্রান্ত কাজের ভার নেবার আগে তাঁদের বলা হ'ল অষ্টম পন্থা বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ এবং তাদের কার্য-পদ্ধতি ভাল ক'রে জেনে নিতে। এই সব বিভাগের কর্মকর্তারা এসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। শিক্ষাবিভাগের কাজ দেখে তাঁরা সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হলেন।

সি-আনের অতিথি ভবনের সামনে দু'জন চীনা বয় স্কাউটের সঙ্গে ডাঃ বসু—তাঁদের পেছনে ভারতীয় কংগ্রেসের য়্যাম্বুলেন্স গাড়ীখানা দেখা যাচ্ছে।





উপরে—ডাঃ অটল।

নীচে—হ্যাঙ্কাউএ ৬৪ নং সামরিক হাসপাতালে কার্যরত ডাঃ কোট্‌নিস্‌ এবং ডাঃ চোলকার।



অষ্টম পন্থা বাহিনীতে যে একটিও নিরক্ষর লোক নেই, তার মূলে রয়েছে এই শিক্ষাবিভাগ। সৈন্যদের শুধু লিখতে পড়তেই শেখান হয় না, স্বাধীন চিন্তা করতেও শেখান হয়—যে কোন সেনাবাহিনীর পক্ষেই এটা আশ্চর্য ব্যাপার। যুদ্ধবিরতির স্বল্প অবসরে সমবেত হয়ে তারা স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সেনা-বাহিনীর প্রত্যেকটি দলের নিজস্ব ক্লাব, লাইব্রেরী এবং নিজেদের পরিচালিত খবরের কাগজ আছে—সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে এই খবরের কাগজগুলি ছাপা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সময় তারা নিজেদের বইগুলি সঙ্গে নিয়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে একটা অসাধারণ রাজনৈতিক চেতনা দেখা যায়। তারা শুধু ভাল যোদ্ধাই নয়; কেন তারা যুদ্ধ করছে, তাও তারা বেশ ভাল ক'রেই জানে। আগে, লালফৌজের আমলে, সৈন্যদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হ'ত; এবিষয়ে তারই ধারা অষ্টম পন্থা বাহিনীতে অনুসৃত হচ্ছিল। তবে আগে স্বভাবতঃই শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল এই শিক্ষার মুখ্য বিষয়, আর এখন জোর দেওয়া হয় জাপ-বিরোধী সংগ্রামে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর।

অষ্টম পন্থা বাহিনীর আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং কৌতুহলোদ্দীপক বিভাগ আছে—বাংলায় এর নাম দেওয়া যেতে পারে "শত্রু-সংযোগ বিভাগ" (Enemy Work Department)। এর কাজ জাপানী সৈন্য ও যুদ্ধ-বন্দীদের

মধ্যে প্রচার-কার্য চালানো। অষ্টম পন্থা বাহিনীর প্রত্যেক 'স্কোয়াডে' (দশজন ক'রে সৈন্য নিয়ে এক একটি 'স্কোয়াড্' গঠিত) অন্ততঃ একজন জাপানী-ভাষা-জানা লোক থাকা চাই। এর উদ্দেশ্য, শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হবার সময় সে জাপানী ভাষায় প্রচার-ধ্বনি বলতে পারবে। প্রথমে জাপানী সৈন্যরা বড় একটা আত্মসমর্পণ করত না, কারণ তাদের অধিনায়করা তাদের শেখাত যে ধরা পড়লে চীনারা তাদের মেরে ফেলবে। এখন অষ্টম পন্থা বাহিনী শুধু মেশিনগান্ এবং রাইফেল দিয়েই শত্রুদের আক্রমণ করে না —সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে এবং চীৎকার ক'রে জাপানী সৈন্যদের প্ররোচিত করে দলত্যাগ ক'রে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে; বুঝিয়ে বলে যে তাদের দলে এলে তারা সহকর্মীর মতই ব্যবহার পাবে। শত শত জাপানী সৈন্য স্বেচ্ছায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। "শত্রু-সংযোগ বিভাগ" এদের নূতন আদর্শে গড়ে তোলে। এদের অনেকে অষ্টম পন্থা বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজেদের প্রাক্তন সহকর্মীদের মধ্যে প্রচার-পুস্তিকা বিতরণ করতে সাহায্য করে। এই রকম কয়েক জন ফ্যাসি-বিরোধী জাপানীর সঙ্গে ডাক্তারদের আলাপ হয়। তাঁরা দেখে বিস্মিত হন যে এই জাপানীরা গণতন্ত্র সম্বন্ধে একান্ত আগ্রহশীল এবং নিজেদের জঙ্গীবাদী ধনতান্ত্রিক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এরা প্রকাশ্যভাবে বিদ্বেষ পোষণ করে। কৃষকশ্রেণী থেকে যারা সেনাদলভুক্ত

হয়েছে, সেই সব সাধারণ জাপানী সৈন্যকে সহজেই তাদের রণোন্মাদনা থেকে মুক্ত করা যায়; কিন্তু জাপানী সেনা-নায়কদের মত বদলানো বড় শক্ত—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক নীতিতে তাদের দীক্ষিত করা যায় না বললেই চলে।

দু'সপ্তাহ বিশ্রাম ক'রে এবং এই সব দেখেশুনে নিয়ে ডাক্তাররা কাজ স্থরু করলেন। বিভিন্ন গ্রামে চাষীদের কুটিরে সামরিক হাসপাতালের 'ওআর্ড'গুলি ছড়ানো ছিল। কেন্দ্রস্থলে একটি গ্রামে ছিল চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কার্যালয়—এখানে অস্ত্রোপচার হ'ত, ওষুধপত্রও এখানেই তৈরী হ'ত এবং জমা থাকত। রোগীদের অধিকাংশই আহত সৈনিক। ডাক্তাররা পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে যেয়ে তাদের দেখাশুনো করতেন। উত্তর চীনের তীব্র শীতে এ অভিজ্ঞতা তাঁদের খুব প্রীতিপ্রদ হ'ত না। অষ্টম পন্থা বাহিনীর সহকর্মীদের সঙ্গে যে ধরণের খাদ্য তাঁরা পেতেন, তাও খুব নিকৃষ্ট এবং উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণে বঞ্চিত। ডাঃ অটলের শরীরে এসব অনিয়ম বেশী দিন সহ্য হ'ল না। একটি বিষাক্ত ফোঁড়ায় তিনি আক্রান্ত হ'লেন, সেই সঙ্গে রক্তদুষ্টিও দেখা দিল। তাঁর স্বাস্থ্যের এই অবস্থা দেখে সহকর্মীরা তাঁকে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। মার্চ মাসে তিনি হাঁটা পথে ইয়েনানে রওনা হ'লেন; সেখানে থেকে চুংকিঙ্ হয়ে তাঁর ভারতবর্ষে ফেরবার কথা।

দেড় বৎসরের অধিককাল যিনি ছিলেন আদর্শ বন্ধু ও নেতা, সেই ডাঃ অটল চলে যাওয়ায় বসু ও কোট্‌নিস্‌ দুঃখে অভিভূত হ'লেন।

কিন্তু যুদ্ধের কঠোর ঝঞ্ঝাবিক্ষোভের মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রেম— এ সব ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের কোন মূল্য নেই। যে-সব হাসপাতালে তাঁরা কাজ করতেন, সেগুলি রণাঙ্গণ থেকে অনেকটা দূরে। সেখানে পৌঁছাতে আহত সৈন্যদের দু'তিন দিন সময় লাগত,—ফলে আসবার পথে তাদের ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে উঠত, পথেই অনেকের মৃত্যু হ'ত। "আহতদের আসবার জন্য অপেক্ষা করলে ডাক্তারদের চলবে না— তাঁদের নিজেদেরই যেতে হবে আহতদের কাছে"—ডাক্তার বেথুনের এই উক্তি তাঁদের মনে পড়ল। অসমসাহসী, আদর্শনিষ্ঠ ডাঃ বেথুনই প্রথম ভ্রাম্যমান মেডিকাল ইউনিট গড়ে তোলেন। এই ইউনিটগুলি আক্রমণকারী সৈন্যদের সঙ্গে ঘুরে রণাঙ্গণ থেকে এক ক্রোশের মধ্যে আহতদের চিকিৎসা করত। এক একটি ইউনিটে সাধারণতঃ থাকতেন একজন ডাক্তার ও তাঁর একজন সহকারী, একজন কম্পাউণ্ডার ও দু'জন নার্স। মালপত্র বইবার জন্য প্রত্যেক ইউনিটকে একটি খচ্চর দেওয়া হ'ত। অনবরত চলার ওপরেই থাকতে হ'ত এই ইউনিটগুলিকে—সময় সময় এমনও হ'ত যে জিনিষপত্র গুছিয়ে যাত্রার জন্য তৈরী হ'তে তারা পাঁচ মিনিটের বেশী সময় পেত না।

কোট্নিস্ ও বসুর বিশেষ অনুরোধে তাঁদের এই রকম একটি ইউনিট গড়তে দেওয়া হ'ল। তাঁদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে একটি অতি উচ্চশ্রেণীর রেজিমেণ্টের সঙ্গে এই ইউনিটকে যুক্ত করা হ'ল। এই রেজিমেণ্টটি বিভিন্ন অঞ্চলে শত্রু-সেনার ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাচ্ছিল। একমাস কাল এই রেজিমেণ্টের সঙ্গে ঘুরে তাঁরা বস্তুতঃ রণাঙ্গণেই কাজ চালালেন। এমনি ক'রে তাঁরা কার্যক্ষেত্রে অষ্টম পন্থা বাহিনীর রূপ দেখতে পেলেন। তাঁরা দেখলেন, রেজিমেণ্টটি ভারী মেশিনগান ও ট্রেঞ্চমর্টারে সুসজ্জিত—এর অধিকাংশই শত্রুদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। সৈনিকরা আহত হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কৃষক স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের নিয়ে আসত চিকিৎসার জন্য। প্রাথমিক প্রতিবিধানের পর আহতদের পাঠান হ'ত সামরিক হাসপাতালে। তবে যাদের আঘাত এত গুরুতর যে চলাচলে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে, তাদের পাঠান হ'ত না। স্থানীয় অধিবাসীরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করত ব'লে সহজেই সব ব্যবস্থা হ'ত। আহতদের জন্য ফলমূল এনে দেওয়া থেকে অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরী করা পর্যন্ত সবই তারা সব সময় আগ্রহের সঙ্গে করত।

একমাস পরে ডাঃ বেথুনের শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্য তাঁদের উটাইয়ে যাবার নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। উটাই জায়গাটি শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত।

এপ্রিল মাসে তাঁরা রওনা হলেন। দেড় হাজার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে তাঁরা যখন সেখানে পৌঁছালেন, তখন সেপ্টেম্বর মাস সুরু হয়েছে। জাপ-বহুল স্থানগুলি এড়িয়ে যাবার জন্য তাঁদের খুব আঁকাবাঁকা ঘোরা পথে চলতে হয়েছিল। সমস্ত উত্তর চীন অতিক্রম ক'রে তাঁরা পেকিন সহরের সীমারেখা পর্যন্ত পৌঁছান। জুলাই মাসে তাঁরা পেকিনের উপকণ্ঠ ছাড়িয়ে যান। একটি পাহাড়ের ওপর থেকে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরীর দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়েছিল। তখন রাত হয়েছে। উজ্জ্বল দীপমালায় পেকিন এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। কিন্তু এই মহানগরী আজ আর চীনের জীবন, শিল্প ও সংস্কৃতির মহান্ কেন্দ্র নয়, জাপ-দস্যুদের সেনানিবাস মাত্র—এ-কথা ভাবতেই এই দৃশ্যের সমস্ত সৌন্দর্য মুছে গেল তাঁদের মন থেকে।

তাঁদের এ-যাত্রাকে কোন মতেই প্রমোদ-ভ্রমণ বলা চলে না। পথে বহুবার তাঁরা শত্রু-বাহিনীর যাতায়াতের পথ (নদী, রেললাইন ও রাস্তা) অতিক্রম করেছেন। অনেক সময় জাপানী শিবিরের এক মাইলের মধ্যে গম ও 'কাওলিয়াঙের' ক্ষেতের মধ্য দিয়ে তাঁদের এগোতে হয়েছে। বাধ্য হয়ে রাত্রে পথ চলাই তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল। একদিন রাত্রে মাঠের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে তাঁরা শত্রুসেনার এত কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন যে ডাঃ বসু ঘুমের ভাব কাটাবার জন্য অসাবধানে একটি সিগারেট

ধরাতেই নিকটবর্তী জাপানী শান্ত্রীর রাইফেলের একটা গুলি শোঁ ক'রে তাঁদের মাথার ঠিক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সশস্ত্র রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার সময় তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালগুলি পরিদর্শন ক'রে সেগুলির উন্নতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেন; সমাগত সামরিক ও বেসামরিক রোগীদের চিকিৎসাও করতেন। এই বিরাট যাত্রা-পথের সর্বত্রই তাঁরা জাতীয় নবজাগরণের আভাস দেখতে পেলেন। ছোট ছেলেমেয়েরা গ্রামের প্রবেশপথে পাহারা দিচ্ছে, কৃষকরা "আত্মরক্ষা বাহিনী" সংগঠন করছে, "তরুণ শিক্ষকরা" লেখাপড়া শেখাচ্ছে। একটি গ্রামে ঢুকে তাঁরা দেখেন, পথের ধারে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর চক দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে "কম্যুনিস্ট-কুওমিনটাঙের পারস্পরিক সহযোগিতা চাই।" একটি ছেলে তাঁদের বলল, এই সেদিনের "শিক্ষা"। পথ দিয়ে যত লোক চলেছে, তাদের কাউকেই তারা এ শিক্ষা না নিয়ে যেতে দিচ্ছে না। এমন কি ভারতীয় ডাক্তারদেরও তারা এ কথা শিখিয়ে তবে যেতে দিল।

চীনের মেয়েদের নবীন কর্মজীবনও তাঁরা এই পথে দেখতে পেলেন। এরা সেই প্রাচীন যুগের লজ্জাবনতা, সুচারু-চরণা চীনা নারী নয়। নবযুগের সাহসিকা নারী এরা। "মহিলাদের জাতীয় মুক্তি-সংঘ" নামক প্রতিষ্ঠানের

পরিচালনায় এরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছে। নিজেদের সম্মান ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই মেয়েরা সামরিক শিক্ষা নিচ্ছে, গণশিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করছে, চাষের কাজ করছে; অনেকে দিনের বেলা রান্নাবান্না করে, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করে, আর রাত্রিবেলা গেরিলা বাহিনীতে কাজ করে।

ভারতীয় গ্রামের মত চীনের প্রত্যেক বাড়ীতে চরকা দেখে তাঁরা আশ্চর্য হ'লেন। মেয়েরা চরকায় সুতো কেটে কাপড় বোনে; বয়ন-সমবায়গুলি (Textile Co-operatives) এই কাপড় দিয়ে দেশের অভাব মেটায়।

প্রত্যেক গ্রামেই জনসভা ক'রে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানান হ'ল। একবার এই রকম এক সভায় আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় বিশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। জাপানী সেনা-শিবির থেকে মাইল পাঁচেক দূরে এক বনের ভেতর এই সভা হয়। সভার কাজ যতক্ষণ চলছিল, ততক্ষণ স্থানীয় "আত্মরক্ষা বাহিনী" চারিদিকে পাহারা দিচ্ছিল। এ সভার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, জাপ-অধিকৃত গ্রামের নরনারীরাও এতে যোগ দিয়েছিল। এদের কাছ থেকে ডাক্তাররা অধিকৃত অঞ্চলে জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শুনতে পেলেন—নারী-নিগ্রহ, 'হীরোঈন্' * এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্য আমদানী ও যদৃচ্ছা

* আফিং থেকে তৈরী এক রকম মাদক-দ্রব্য।

বিক্রয়, চাষীদের কুটিরে ঢুকে ইচ্ছামত লুঠ-তরাজ, এইসব ছিল জাপানী সৈন্যদের নিত্যকর্ম।

উত্তর চীনে এই অদ্ভুত পর্যটনের সময় তাঁরা গেরিলা বাহিনীকে কার্যরত দেখলেন। এদের সব চেয়ে পছন্দসই কাজ হ'ল জাপানীদের তৈরী রেলপথ থেকে রেলগুলি তুলে নেওয়া। এতে শত্রুদের চলাচলের ব্যবস্থা ব্যাহত হয়; শুধু তাই নয়, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভের যে-সব কারখানায় রাইফেল তৈরী হয়, তাদের কাজের জন্য দরকারী লোহাও এমনি ক'রে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতিদের যে-সব বন্দুকের 'কারখানা' আছে, এই কারখানাগুলি অনেকটা সেই ধরণের। গেরিলা বাহিনীর দ্বারা অপসারিত রেলগুলি থেকে রাইফেল, হাতবোমার খোল, এমন কি লাঙ্গলের ফলা পর্যন্ত তৈরী করা হ'ত।

পেকিনের কাছে তাঁরা প্রথম বিখ্যাত "চীনের প্রাচীর" দেখেন। এর পর তাঁদের যাত্রাপথ যখন আবার এই মহা-প্রাচীরের ওপর দিয়ে যায়, তখন তাঁরা লক্ষ্য করলেন, প্রাচীরটি প্রায় ধ্বংস হয়ে এসেছে। সুপ্রশস্ত এবং প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু এই প্রাচীরটি পর্বত ও উপত্যকার ভেতর দিয়ে শত শত মাইল চলে গেছে। দু'দিকে পাথর দিয়ে গাঁথা, মাঝখানে মাটি ভরা। এই মাটি যে কত উর্বর, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন প্রাচীরের ওপর চাষ-আবাদ দেখে—চাষীরা

যে-সব জায়গায় ভূট্টার আবাদ করেছে, সে-সব জায়গা ফসলে ভরে উঠেছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এই সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর চীনের দৃঢ়বদ্ধমূল ভিত্তির মতই দাঁড়িয়ে আছে। বর্বর আক্রমণকারীদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্য প্রাচীন চীনের সম্রাটরা এই প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই বিরাট প্রাচীর গড়বার কাজে চীনা কৃষকদের বেগার খাটানো হয়েছিল। যে-সব চাষীকে এই কাজের জন্য জবরদস্তি ক'রে বাড়ী থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের দুঃখের কাহিনী পল্লীগীতিকা ও গাথায় বেঁচে আছে। সমসাময়িক পটভূমিকায় এই ধরণের কতকগুলি গীতিগাথাকে নূতন রূপ দিয়েছেন আধুনিক চীনের কবিরা। তাঁরা চীনের সেই নূতন প্রাচীরের প্রশস্তি গেয়েছেন, যে বিরাট প্রাচীর লক্ষ লক্ষ চীনবাসী নিজেদের রক্ত-মাংস দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে জাপানী অভিযানকে প্রশমিত করবার জন্য। বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক এবং কামানে সজ্জিত আধুনিক শত্রুকে বাধা দেবার ক্ষমতা চীনের পুরানো প্রাচীরের নেই। কিন্তু এই নূতন প্রাচীর—চীনের এই ঐক্যবদ্ধ, প্রতিরোধশীল জনগণ—শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করেছে আরও সুষ্ঠুভাবে। নিপীড়িত ক্রীতদাসের শ্রমে এ প্রাচীর গড়া হয়নি—এ প্রাচীর গড়ে উঠেছে স্বাধীন নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ জাতি-প্রেমে।

সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ বসু ও ডাঃ কোট্নিস্ চাহার প্রদেশে লাইয়ুআনের কাছে একটি জায়গায় পৌঁছালেন। এখানে তাঁদের দুজনের ওপর দু'টি ভ্রাম্যমান মেডিকাল ইউনিট খুলে দু'টি পৃথক রেজিমেণ্টের সঙ্গে কাজ করবার ভার পড়ল।

ডাঃ বসু যে রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত হলেন, তার ওপর আদেশ হ'ল তুঙ্ তুয়ান্‌পো গ্রাম পুনরধিকার করবার জন্য। গোপন সূত্রে খবর এসেছিল যে সে গ্রামের জাপ-বাহিনীর কাছে ভারী কামান-বন্দুক কিছু নেই, শুধু মেশিনগানে তারা সজ্জিত। হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী হবে, এই আশঙ্কায় ডাঃ বসু আক্রমণস্থানের একমাইল পেছনেই তাঁর মেডিকাল ইউনিট নিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন। দেড় হাজার সৈন্য জাপ সেনানিবাসের ওপর হানা দিল। সারারাত সমানে গুলি চলতে লাগল, আর স্ট্রেচার-বাহকরা আহতদের নিয়ে আসতে লাগল। সকালের দিকে জাপানীদের মেশিনগানের আওয়াজ ক্রমে কমে' এল। সেনানিবাস থেকে জাপানী হেড্‌কোয়ার্টারে প্রেরিত একটি বেতারবার্তা ধরে আক্রমণকারীরা জানতে পারল যে জাপানীদের গোলাবারুদ আর নেই বললেই চলে। এই খবর পেয়ে হেড্-কোয়ার্টার থেকে প্যারাস্যুটে ক'রে গোলাবারুদ ফেলে দেবার জন্য একখানা বিমানপোত এল। ভাগ্য সেদিন জাপানীদের প্রতিকূল, তাই বাতাসের গতিতে দামী মালবোঝাই প্যারাস্যুটগুলি গ্রামের বাইরে খোলা মাঠের ওপর পড়ল। চীনা সৈন্যরা

সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি দখল করল। ফলে পাঁচলক্ষ .কার্তুজ তাদের হাতে এল, আর সেই সঙ্গে বিশটি প্যারাসুটের দামী সিল্ক। এ ছাড়া গোলাবারুদের বাক্সে হাজার হাজার 'দমদম'-বুলেট পাওয়া গেল। আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে জাপানীরা এই ভয়াবহ মারণাস্ত্র ব্যবহার করে। এই 'দমদম'-বুলেট শরীরের যে কোন জায়গায় লাগলে সে জায়গার মাংসপেশী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর ভেতর থেকে অসংখ্য ছোট ছোট লোহার টুকরো সমস্ত শরীরে বিঁধে যায়—যে অঙ্গে এ বুলেট লাগে, সে অঙ্গ ফেটে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বুকে বা তলপেটে 'দমদম'-বুলেট লাগলে তো মৃত্যু অবধারিত।

গোলাবারুদ পাবার কোন আশা নেই দেখে জাপানী সৈন্যরা জাপানীদের বিশিষ্ট পন্থায় আত্মহত্যা করল। একজন কোরীয়ান্ দোভাষী মাত্র বেঁচে ছিল, তার কাছেই এই ব্যাপক আত্মহত্যার কাহিনী শোনা গেল। জাপানী সেনানিবাসের একশ বিশ জন সৈন্যের মধ্যে মাত্র পঁচিশজন অবশিষ্ট ছিল। তারা আকণ্ঠ মদ গিলে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদী গান গেয়ে, গ্রামে এক অবাধ অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল। নারী-ধর্ষণ ক'রে, গ্রামের অনেক পুরুষকে হত্যা ক'রে, নিজেদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তারা পুড়িয়ে ফেলল। তারপর শরীরের সঙ্গে একটি ক'রে হাতবোমা বেঁধে, সর্ব্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে সবাই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরাজয়ের মুহূর্তে আত্মনাশের এই যে

বিকৃত অথচ গভীরভাবে অভিভবনকারী পন্থা, এরই নাম 'হারাকিরি'।

আক্রমণকারী চীনাবাহিনী গ্রামে প্রবেশ ক'রে এক বিভীষিকাময় দৃশ্যের সম্মুখীন হ'ল—মোটরগাড়ীগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, ঘোড়াগুলিকে গুলি ক'রে মারা হয়েছে, স্তূপীকৃত গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, মানুষের পোড়া হাড় চারিদিকে ছড়ান। কুটির থেকে এবং অন্যান্য গোপন স্থান থেকে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এল। বহু-সপ্তাহব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণার ছাপ তাদের মুখে স্পষ্ট। বয়স্ক লোকেরা তাদের মেয়েদের নিয়ে এল চিকিৎসার জন্য! এদের মধ্যে অনেককে শিশু বললেই চলে। নিপ্পনের 'বীর' যোদ্ধারা এদের ওপর যে অকথ্য পৈশাচিক অত্যাচার করেছে, তার নিদর্শন দেখে ডাঃ বসু স্তম্ভিত হলেন।

এই গ্রামটি পুনরধিকৃত হবার সংবাদে লাইয়ুআন অঞ্চলে যেন আনন্দের জোয়ার এল। আশেপাশের গ্রাম থেকে কৃষকরা মুক্তিদাতা সেনা-বাহিনীর জন্য নানারকম উপহার নিয়ে এল। আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্যে বন্ধুতে বন্ধুতে পুনর্মিলন হ'ল; আর এরি মধ্য দিয়ে জেগে উঠল আগামী প্রভাতের আশাদীপ্ত স্বপ্ন, যেদিন প্রত্যেকটি গ্রাম ও সহর শত্রুর করাল কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে ডাঃ কোট্‌নিস্‌ও তাঁর রেজিমেণ্টের সঙ্গে অন্য একটি পুনরধিকৃত গ্রামে ঠিক এই ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করেছিলেন। ফুপিঙের কাছে হেড্‌কোয়ার্টারে যখন ডাঃ বসুর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল, তখন দুই বন্ধুতে কত কথাই না হ'ল! এখানে ডাঃ বেথুনের স্মৃতিতে একটি শিবির-হাসপাতাল ও মেডিকাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল—তার নাম "বেথুন আন্তর্জাতিক স্বস্তি হাসপাতাল ও মেডিকাল স্কুল"। চীনাভাষায় ডাঃ কোটনিসের খুব ভাল দখল হয়েছিল ব'লে তাঁকে এই স্কুলে পড়াবার কাজ দেওয়া হ'ল। ডাঃ বসু ইয়েনানে ফিরে যাবার আদেশ পেলেন।

দু'বছর প্রীতিকর সাহচর্যের পর তাঁরা দু'জন এবার বিচ্ছিন্ন হ'লেন। বিদায় নেবার সময় তাঁরা প্রতিশ্রুত হলেন যে দু'জনে একসঙ্গে ভারতবর্ষে ফিরবেন। তখন কে জানত, এই তাঁদের শেষ দেখা!

গণতন্ত্রের কাঠামো

"জাগো! দাসত্ব-শৃঙ্খল যারা পরতে চাও না, তারা সবাই জাগো! আমাদের রক্তমাংস দিয়ে আমরা গড়ে তুলব নূতন মহাজগৎ। চরম সঙ্কট-লগ্ন এসেছে আমাদের জীবনে। নাগরিকরা সবাই উচ্চকণ্ঠে বলুক 'জাগো'! লক্ষ লক্ষ হৃদয় আমরা একসূত্রে বেঁধেছি। শত্রুর অনলবর্ষণের সম্মুখীন হ'তে আমরা প্রস্তুত।"

—চীনা জাতীয় সঙ্গীত।

পদব্রজে ছ'শ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ইয়েনানে পৌঁছাতে ডাঃ বসুর পুরো দু'মাস লাগল। এই দীর্ঘ যাত্রা-পথের অভিজ্ঞতা তাঁর খুবই রোমাঞ্চকর হয়েছিল। অনেক আশ্রয়প্রার্থী নারী ও শিশু তাঁদের দলে ছিল। পথে জাপবাহিনী সাতদিন ধ'রে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যে সশস্ত্র রক্ষীদল ছিল, তাদের ওপর সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবার নির্দেশ ছিল, কারণ সম্মুখ সংঘর্ষে অযথা বেসামরিকদের প্রাণহানি হবার আশঙ্কা ছিল। অনেক সময় কোন গ্রামে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে গ্রামের স্কাউটরা তাঁদের জানাত যে শত্রুসেনা খুব কাছাকাছি টহল দিচ্ছে—ফলে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে পাঁচমিনিটের মধ্যেই তাঁদের সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হ'ত।

যুদ্ধ এবং শত্রুর আক্রমণ সত্ত্বেও চীনারা কেমন ক'রে অর্থনৈতিক জীবনে স্বয়ং-স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা করছিল তার প্রমাণ পেয়ে ডাঃ বসু এবারও মুগ্ধ হলেন। কৃষকদের

দৈনন্দিন অভাব মেটাবার জন্য সুদূর অভ্যন্তরের গ্রামগুলিতে ছোটখাট নানারকম শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ওষুধের অভাবই তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। এক সময়ে জাপানী অধিকৃত সহর থেকে ওষুধপত্র কিনে গোপনে গেরিলা অঞ্চলে নিয়ে আসা চলত। কিন্তু শত্রুরা এ কৌশল জানতে পেরে ওষুধপত্র নিয়ন্ত্রণের কড়া বন্দোবস্ত করে। তখন থেকে চীনারা নিজেদের যা আছে, তারই উন্নতিসাধনে মন দিয়েছে। একটি গ্রামে ডাঃ বসু দেখলেন সমবায় কারখানায় ব্যাণ্ডেজ, তুলো, 'গজ' এবং অস্ত্রচিকিৎসার সাদাসিধে যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে। প্রাচীন চীনা ভেষজবিধানকে আধুনিক প্রয়োজনের উপযোগী ক'রে পুনর্গঠন করা হচ্ছিল। কাজ-চালানো-গোছের ল্যাবরেটরীতে গবেষকরা বিভিন্ন উপকারী চীনা ভেষজের কার্যকরী শক্তিকে অব্যাহত রেখে বড়ি তৈরী করছিলেন, যাতে বড় বড় হাঁড়ি-ভর্তি পাঁচন এবং বস্তা বস্তা লতাপাতা নিয়ে ডাক্তারদের ঘুরতে না হয়। তবে পচন-নিবারক, 'য়্যানাস্থেটিক' এবং রোগবীজাণু-নাশক ভেষজ তাঁরা তখনও তৈরী ক'রে উঠতে পারেন নি।

১৯৪০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ বসু ইয়েনানে পৌঁছালেন। সেখানে 'আন্তর্জাতিক স্বস্তি হাসপাতালে' তিনি নাসা-কর্ণ-চক্ষু এবং কণ্ঠ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অস্ত্র-চিকিৎসক নিযুক্ত হ'লেন। ইয়েনানে তাঁরা যে 'আদর্শ হাসপাতাল' স্থাপন করেছিলেন, এটি সেই হাসপাতালেরই

নূতন নাম। হাসপাতালটিকে তখন সহর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে এগিয়ে আনা হয়েছে। আগের মতই পাহাড়ের গুহায় হাসপাতালটি অবস্থিত ছিল—তবে রোগীদের জন্য খানকয়েক কুটিরও তোলা হয়েছিল। ডাঃ বসু রোজ বহির্বিভাগের শতাধিক রোগী দেখতেন; এ ছাড়া হাসপাতালের বিভিন্ন ওআর্ডে প্রায় তিরিশটি 'বেড' তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কেউ ছিলেন না, তাই ডাঃ বসুকে সব বিষয়েই 'বিশেষজ্ঞ' হয়ে উঠতে হ'ল।

সাংহাই এবং ক্যান্টনে জনকয়েক হাতুড়ে ভারতীয় চোখের ডাক্তার আছে। আশ্চর্যের কথা এই, তাদের দেখে চীনাদের একটা সাধারণ ধারণা হয়ে গেছে যে ভারতীয় ডাক্তার মাত্রেই চক্ষুচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। ডাঃ বসুর আসবার খবর চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়তেই, তাঁকে দেখাবার জন্য দলে দলে চক্ষুরোগী আসতে লাগল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি রোগীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি তরুণ কৃষক রণাঙ্গণে গোলার আঘাতে দৃষ্টিশক্তি হারায়। গোলা থেকে ছোট ছোট লোহার টুকরো চোখে বিঁধে তার চোখের স্নায়ুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। সেনাদল থেকে ছাড়িয়ে তাকে অক্ষম সৈন্যদের সমবায় সমিতিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তার আর এক বিপত্তি ঘটল, তার এই অবস্থা দেখে তার তরুণী পত্নী তাকে ছেড়ে

চলে গেল। বেচারা স্ত্রীকে এত ভালবাসত যে এই ঘটনায় সে রীতিমত মুষড়ে পড়ে! এমন সময় তার কানে এল সেই "বিজ্ঞ ভারতীয় ডাক্তারের" কথা। সে তখন আন্তর্জাতিক স্বস্তি হাসপাতালে এসে ডাঃ "বা স্সু হুআ"র কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করল।

ডাঃ বসু খুব যত্ন সহকারে তার চোখ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, একটি চোখ সব প্রতিকারের বাইরে, তবে আর একটি চোখকে বাঁচাবার সামান্য আশা আছে।

চোখের মণি বিদ্ধ ক'রে, সূক্ষ্ম 'আইরিডেক্‌টমি' অপারেশন করলে চোখটি ভাল হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অস্ত্রোপচার সফল না হ'লে চোখটি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কাও ছিল। ডাঃ বসু তাকে একথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। ফল যাই হোক না কেন, সে কথা না ভেবে অস্ত্রোপচার করবার জন্য সে তাঁকে অনুরোধ জানাল। কিন্তু চোখে অস্ত্রোপচার করবার জন্য যে সব অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দরকার হয়, তা কিছুই ডাঃ বসুর ছিল না। স্থানীয় কামারদের সমবায় কারখানায় ঐ সব যন্ত্রপাতি গড়াবার জন্য তিনি নকসা ক'রে দিলেন। কারখানার কর্মীরা খুব আগ্রহের সঙ্গেই এ কাজ করতে রাজী ছিল। কিন্তু তারা যে সব যন্ত্রপাতি তৈরী করল, সেগুলি উপযুক্ত পরিমাণে সূক্ষ্ম হ'ল না। ডাঃ বসুর একজন উপায়-কুশল চীনা সহকর্মী তাঁকে পরামর্শ দিলেন বাঁশের তৈরী অস্ত্র ব্যবহার করতে, কারণ সেগুলিকে

যতদূর প্রয়োজন সূক্ষ্ম ক'রে নেওয়া চলে। এ পরামর্শ খুবই কাজে এল, কিন্তু তবু অভাব রইল একখানা খুব ছোট ধারালো কাঁচির। অক্ষিচ্ছদের (cornea) মৃত তন্তুগুলি (tissues) কেটে ফেলবার জন্য ঐ রকম একখানা কাঁচির দরকার ছিল। শেষে যখন মনে হ'ল কোন উপায়ই নেই, তখন হঠাৎ ডাঃ বসু একজন চীনা ডাক্তারের কাছে ঠিক ঐ রকম একখানা কাঁচি দেখতে পেলেন। সে ভদ্রলোক কাঁচিখানা দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিলেন। ডাঃ বসু সেখানা তাঁর হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে জীবাণুমুক্ত ক'রে নিলেন। তারপর তিনি অস্ত্রোপচার করলেন। অস্ত্রোপচার এত নিখুঁত হল যে তা শেষ হতে না হতেই রোগী চিৎকার ক'রে উঠল, "আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি।"

এই সত্য কাহিনীর উপসংহার হ'ল আনন্দের মধ্যে ; যুবকটির স্ত্রী তার কাছে ফিরে এল। সে তখন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে আবার সেনাদলে যোগ দিল। চীনে ভারতীয় ডাক্তাররা অন্ততঃ পঁচিশ হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন। ওপরের ঘটনাটিতে তারই একটির মানবিক দিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

* * * *

১৯৪০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত ডাঃ বসু ইয়েনানে কাজ করলেন। প্রথমদিকে যে-সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, তার তুলনায়

এ কাজ অনেকটা একঘেঁয়ে ধরণের—হাসপাতালের ধরাবাঁধা কাজ, অন্যান্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন করা, বাড়ী বাড়ী ঘুরে রোগী দেখা, এই তাঁকে করতে হ'ত। এই ক'বছরের মধ্যে তিনি যে শুধু হাজার হাজার চাষী ও সৈনিকের চিকিৎসা করেছিলেন তাই নয়, মাও ৎসে-তুঙ্ এবং চু তে'র মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তাঁর চিকিৎসাধীনে ছিলেন।

কোরীয়ান, ফর্মোজান্, মালয়ী, জাভানীজ, শ্যামদেশীয় এবং ফ্যাসি-বিরোধী জাপানী প্রভৃতি বহু বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধরণের নরনারী তখন ইয়েনানে বাস করত। এদের অনেকের সহযোগিতায় ডাঃ বসু "প্রাচ্য জাতিমণ্ডলের ফ্যাসি-বিরোধী সংঘ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুললেন। সংঘের সভ্যসংখ্যা হ'ল দু'শ। জেনারেল চু তে' এই সংঘের সভাপতি হলেন। বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা, পুস্তিকা, বেতার-বার্তা প্রভৃতির সাহায্যে ফ্যাসি-বিরোধী প্রচার কার্য চালানোই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

কালক্রমে সংঘের কাজ এত প্রসার লাভ করল যে স্থানীয় পার্লামেণ্টে এই সংঘের প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার সীমান্ত অঞ্চলের সরকার স্বীকার ক'রে নিলেন। এখানকার পার্লামেণ্টে বিভিন্ন নির্বাচন-কেন্দ্রের ভোটদাতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়াও সমস্ত স্কুল, কলেজ, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এবং কৃষক, মজুর, বণিক ও ভূস্বামী-সমিতির প্রতিনিধি থাকে। যুদ্ধের সময়

চারিদিকে যখন গেরিলাদের অভিযান চলছে এবং গ্রামগুলি বছরে হয়ত দু'তিন বার হাত বদলাচ্ছে, তখনও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন সম্ভব হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর মতে যুদ্ধের সময় নির্বাচন সম্ভব নয়—তাদের এ মত যে সর্বৈব মিথ্যা, এ কথা প্রমাণ করেছে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা।

সব দেশেই বৈদেশিকদের পক্ষে নাগরিকের অধিকার পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। যারা ককেশিয়ান জাতিভুক্ত নয়, তারা আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকের মর্য্যাদা পায় না।* দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসীদের ভোট দেবার অধিকার নেই। কিন্তু যুদ্ধকালীন চীনে যে-কেউ চীনের জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে, সে-ই নাগরিক হবার অধিকার পায়—শুধু নাগরিক কেন, ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যও হ'তে পারে সে। "প্রাচ্য জাতিমণ্ডলের ফ্যাসি-বিরোধী সংঘ" থেকে সীমান্ত অঞ্চলের পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে ডাঃ বসুর নির্বাচনেই এ-কথার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি দু'জন ফ্যাসি-বিরোধী জাপানীও চীনের নাগরিকদের এই আইন-সভার সদস্য হয়েছিলেন; ইয়েনানের কাছে জাপ যুদ্ধবন্দীদের শিক্ষার জন্য যে "জাপানী কৃষক ও শ্রমিক বিদ্যালয়" স্থাপিত

---

* পাঠকরা জানেন, সম্প্রতি (জুন ১৯৪৬) যুক্তরাষ্ট্রে এ বাধা অপসারিত হয়েছে।
—অনুবাদক।

হয়েছিল, সেই বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে এই দু'জন জাপানী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। এই পার্লামেন্টে সব শ্রেণীরই প্রতিনিধি আছে—খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পণ্ডিত, বয়স্ক চাষী, রেশমী-গাউন-পরা স্থূলকায় জমিদার, সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারী ও সৈন্য, ছাত্র, আধুনিকা তরুণী এমন কি লোহার-জুতো-পরা বয়স্কা চীনা মহিলারা পর্যন্ত এর সদস্য। এ ছাড়া মঙ্গোলীয়, মাঞ্চু, তিব্বতী, মুসলমান এবং অন্যান্য সংঘালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও আছে। রাজনীতির দিক দিয়েও এই পার্লামেন্ট একটি "সম্মিলিত" প্রতিষ্ঠান, কারণ কম্যুনিস্ট এবং কুওমিনটাঙ্গ—দু'দলেরই প্রতিনিধি এতে আছে। মোট সদস্য-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী কম্যুনিস্ট হবে না, এ-রকম ব্যবস্থা আছে। এই চীনের ভাবী গণতন্ত্রের কাঠামো!

১৯৪১ খৃস্টাব্দের নবেম্বর মাসে ডাঃ বসু পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হ'ন। যতদিন তিনি চীনে ছিলেন, ততদিনই তিনি সদস্যরূপে কাজ করেছেন—এমন কি এখনও তিনি পার্লামেন্টের সদস্য আছেন। ইয়েনানে পার্লামেন্টের অধিবেশন হ'লেই তিনি তাতে যোগ দিতেন। স্থানীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পার্লামেন্টের কাছে বিবৃতি দেবার এবং স্বাস্থ্যবিধির উন্নতি সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করবার ভার দেওয়া হয় তাঁর ওপর। পার্লামেন্টে উপস্থাপিত প্রত্যেক সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনাও বির্তক হ'ত। পার্লামেন্টের

উদ্বোধন উপলক্ষে যে অধিবেশন হয়, তাতে মাও ৎসে-তুঙ্ কম্যুনিস্ট দলের সমালোচনা করলেন এই ব'লে যে মিলিত যুদ্ধপ্রচেষ্টার মূলনীতি বজায় রাখবার জন্য যতটা সতর্ক হওয়া দরকার, ততটা সতর্ক তারা হয় নি। তিনি ঘোষণা করলেন যে গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সহযোগিতা আহ্বান করতে হবে—দলগত রেষারেষির জন্য জাপ-বিরোধী গণ-সংহতিকে দুর্বল করা চলবে না।

পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের জুন মাসে ডাঃ বসু ভারতবর্ষে ফিরতে মনস্থ করলেন। ভারতবর্ষে তখন যা ঘটছিল, চীনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত রয়টারের সংক্ষিপ্ত এবং একদেশদর্শী খবর থেকে তিনি তা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তাই ভারতের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার জন্য তিনি দেশে ফিরে আসতে কৃতসঙ্কল্প হ'লেন। চীনা বন্ধুদের ছেড়ে আসতে তাঁর খুবই দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু তাদেরই মঙ্গলাকাঙ্খায় তিনি ঠিক করলেন, যদি সম্ভব হয়, তা হ'লে নূতন ওষুধপত্র ও চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম সমেত আর একটি মেডিকাল মিশন নিয়ে তিনি চীনে ফিরবেন।

তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্য অনেকগুলি প্রীতিভোজ ও জনসভার ব্যবস্থা হ'ল। চীনা সহকর্মী ও বন্ধুরা তাঁকে বিদায় দেবার সময় যে আন্তরিক প্রীতি জানালেন, তাতে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হলেন।

রোগীরা তাঁর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা দেখাল, তা আরও মর্মস্পর্শী --অনেকে তো তাঁর যাবার কথা শুনে রীতিমত কাঁদতে লাগল। একজন তরুণ চীনা ছাত্র চক্ষুরোগের জন্য তাঁর চিকিৎসাধীনে ছিল; সে অশ্রু-সজল-নেত্রে তাঁকে বলল "আপনি কিন্তু ফিরে এসে আমার চোখ সারিয়ে দেবেন---নয়ত আমি দেশের জন্য লড়ব কেমন ক'রে?"

ডাঃ বসু যখন ভারতগামী বিমান ধরবার জন্য ইয়েনান থেকে চুংকিঙের পথে রওনা হলেন, তখন এ-সব ছাড়া আরও একটি কারণে তাঁর অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি এবং ডাঃ কোট্‌নিস্‌ একবার ঠিক ক'রেছিলেন যে তাঁরা দু'জন এক সঙ্গে ভারতবর্ষে ফিরবেন। কিন্তু কোট্‌নিস্‌ তো তাঁর সঙ্গে ছিলেন না! কোট্‌নিস যে কখনো ফিরে আসবেন না! তিনি তখন আর এ-জগতে নেই!

...ফেরে নাই শুধু এক জন !

Lo, soul, seest thou not God's purpose from the first ?
The earth to be spanned, connected by network,
The races, neighbours, to marry and be given in marriage,
The oceans to be crossed, the distant brought near,
The lands to be welded together.

—WALT WHITMAN.

ডাঃ বসু ইয়েনানে চলে যাবার পর ডাঃ কোট্‌নিস্ ফুপিঙের কাছে হেড্‌কোয়ার্টারে একা রইলেন। তিনি এখানে বেথুন মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও মেডিকাল স্কুল সংগঠন ও পরিচালনার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করলেন। তখন তিনি চীনাভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন ; যে কোন চীনা ডাক্তারের মতই সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে তিনি কাজ চালাতে লাগলেন। চীনকে তিনি নিজের দেশের মতই মনে করতেন। ক্রমেই তিনি চীনের প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়ে উঠছিলেন। প্রথমে যখন তিনি চীনে আসেন, তখন তিনি দুঃসাহসিক-অভিযান-প্রবণ যুবক মাত্র, কোন গভীর চিন্তা বা উদ্বেগ তাঁর ছিল না। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনের বিভীষিকাময় অবস্থার বাস্তব সংস্পর্শে এসে তিনি ফ্যাসিবাদের প্রতি দৃঢ় এবং সুচিন্তিত বিরোধিতার ভাব পোষণ করতে লাগলেন। অনবরত রাষ্ট্রনীতি ও অর্থশাস্ত্র পড়ে এবং

আলাপ-আলোচনা ক'রে তিনি অষ্টম পন্থা বাহিনীর কম্যুনিস্ট সহকর্মীদের সঙ্গে একই আদর্শবাদের ছাঁচে গ'ড়ে উঠছিলেন।

জাপ বাহিনীর পক্ষে উত্তর চীনের প্রতিটি গ্রামে সেনানিবাস রাখা সম্ভব নয়; তাই গেরিলাদের প্রতিরোধকেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত করবার জন্য এবং গ্রাম অঞ্চলের কৃষকদের ভয় দেখাবার জন্য জাপানীরা প্রতি বৎসর একবার ব্যাপক অভিযান চালায়—একে চীনাভাষায় বলে "সাও দাঙ্" (ঝেঁটিয়ে সাফ করা)। একবার এইরকম এক অভিযানের সময় অষ্টম পন্থা বাহিনীর হেড্কোয়ার্টারকে—এবং সেই সঙ্গে বেথুন হাসপাতাল ও মেডিকাল স্কুলকেও—অনবরত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরে যেয়ে শত্রুর বিরাট যান্ত্রিক বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়। অষ্টম পন্থা বাহিনীর সৈন্যরা এই সময় নানা রকম কৌশল ক'রে পথের ধারে ওৎ পেতে এবং রাত্রিবেলা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে জাপানীদের পর্যুদস্ত করত। ডাঃ বসু চলে যাবার পর একমাসের মধ্যেই ডাঃ কোট্নিস্কে এই রকম একটি অভিযানের সম্মুখীন হ'তে হ'ল—এ অবস্থায় অনবরত রাত জাগা, ক্লান্তিকর দীর্ঘ কুচ্-কাওয়াজ, ক্ষুধা এবং শত্রুর অবিরাম গোলাবর্ষণ ইত্যাদিতে স্নায়ুতন্ত্রের ওপর যে ভীষণ চাপ পড়ে, তা সহ্য করতে হ'লে ইস্পাতের মত শক্ত স্নায়ুবিশিষ্ট হওয়া দরকার। অথচ চিন্-ৎসা-চি পীয়েঙ্কু থেকে ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী ডাঃ বসুর কাছে লেখা

একখানা চিঠিতে কোট্‌নিস্ এমন তাচ্ছিল্যভরে এ ব্যাপারের কথা লিখেছেন, যেন এটা মোটেই একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়ঃ—

"তুমি চলে যাবার একমাস পরে শত্রুর প্রত্যাশিত 'সাও দাঙ্' সুরু হয়েছিল। এবার তারা রীতিমত-ভাবে অভিযান চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। উত্তর চীনে তাদের সমরবিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা স্বয়ং বিশ হাজারের ওপর সৈন্যকে চালিত করছিলেন। মাসখানেক আমরা অনবরত শত্রুদের এড়িয়ে 'মার্চ' করেছি—অনেক সময় তাদের খুবই নিকট দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ যে-ভাবে নিজেরাই চলাচলের নির্দেশ দিচ্ছিলেন তা বাস্তবিকই দেখবার জিনিষ; শেখবারও অনেক কিছু আছে তাতে। ছাত্ররা সংবাদ-সংগ্রহ এবং পাহারার কাজ করছিল। শত্রুদের হাতে আমাদের পাঁচজন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আমার নিজের খবর লিখছি—খুব তাড়াতাড়ি প্রথম তিন দল ছাত্রের শেষ পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা হয়েছিল (তাদের সমাবর্তন-উৎসব হবে আগামী কাল), তাই অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দিতে হয়েছে—সেই জন্যই আর সবার মত আমিও বেশ ব্যস্ত ছিলুম। তা

ছাড়া আমি ফিজ্যসির (এ জায়গাটি পীপিং জাপ-বিরোধী শিবিরের পশ্চিমে) ডাঃ প্'য়েঙ্'কে অস্ত্রচিকিৎসা শেখাচ্ছি, তাই সময় বড় কম। যাই হোক, এই অল্প অবসর সত্ত্বেও আমি এখানকার বিভিন্ন কার্যকলাপে যোগ দিয়েছি। নিজের মধ্যে আমি গভীর পরিবর্তন অনুভব করছি।”

ইতিমধ্যে তাঁর নিজের জীবনে একটি ঘটনা ঘটল; ঘটনাটি নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং হৃদয়াবেগের সঙ্গে জড়িত— তবু চীনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের প্রতীক ব'লেও একে ধরা যায়। তিনি একটি চীনা মেয়েকে ভালবেসেছিলেন।

মেয়েটির নাম কুও চিং লান্। সে খুব চট্‌পটে এবং মনোমুগ্ধকারিণী; লম্বায় প্রায় পাঁচফুট, চাঁদের মত গোল মুখ, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। কোট্‌নিস্ যে মেডিকাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই স্কুলেই সে শুশ্রূষা-বিদ্যা পড়াত। পীপিঙের এক স্বচ্ছল পরিবারে তার জন্ম। সেখানকার য়ুনিয়ন মেডিকাল স্কুলে সে ডাক্তারী পড়েছিল। যুদ্ধ বাধবার পর অন্যান্য হাজার হাজার লোকের মত সেও নিজের পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অভিযানকারী জাপানীদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শত শত মাইল হেঁটে, সে শেষ পর্যন্ত অষ্টম পন্থা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

কোট্‌নিসের অধীনেই কুও চিং লান্‌ কাজ করত। যে বীর ভারতীয় যুবক চীনের সেবার জন্য এত ত্যাগস্বীকার ক'রেছেন, তাঁর প্রতি সে কেমন ক'রে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে ভালবাসায় রূপান্তরিত হ'ল—ভালবাসার বন্ধন যেন চীনের সঙ্গে কোট্‌নিসের একাত্ম-বোধকে আরও নিবিড় ক'রে দিল।

কুও চিং লান্‌ সাধারণ চীনা মেয়েদের মত লাজুক ছিল না। সে অনর্গল ইংরাজি বলতে পারত। কোট্‌নিসের সঙ্গে সে নানাবিষয়ে আলোচনা করত—ভারতবর্ষ, চীন, পৃথিবী এবং তাদের দুজনের কথা! শান্তির সময় প্রেমের গতি যতটা মন্থর থাকে, যুদ্ধের সময় তা থাকতে পারে না। সাধারণ অবস্থায় প্রেমনিবেদন, পিতামাতার সম্মতি, সমাজের অনুমোদন, এসবে কত সময়ই না লাগে! কিন্তু যুদ্ধের সময় আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে লোকের এত অবসর থাকে না—প্রেমের গতিও তখন হয় দ্রুততর। তবু কোট্‌নিস্‌ কুও চিং লানের কাছের বিয়ের প্রস্তাব করবার আগে অনেক কিছু ভাবলেন। তিনি তার ওপর অন্যায় করছেন কি-না, চীনারা তাঁকে যে উদার বন্ধুত্ব ও আতিথেয়তা দিয়েছে, তিনি তার মর্য্যাদা নষ্ট করছেন কি-না, এসব প্রশ্ন তাঁর মনে উঠল। প্রাচীন যুগে চীনে বিদেশীদের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষের ভাব ছিল। চীনা সমাজবিধানে আন্তর্জাতিক বিবাহ সমর্থিত হ'ত না, বরঞ্চ নিন্দিতই হ'ত। তাই তিনি ভাবলেন, কুও

চিং লানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হ'লে চীন ভারতের সৌহার্দ্য ও ঐক্যের কোন হানি হবে কি-না। তিনি তো ব্যক্তিগত ভাবে চীনে যান নি, তিনি সেখানে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি—কাজেই কোন কাজ করবার আগে এই বৃহত্তর দায়িত্বের কথা তাঁকে বিচার করতে হবে।

আসলে কিন্তু কোট্‌নিস্ যখন কুও চিং লানের সঙ্গে বিয়ের কথা ওঠালেন, তখন তাঁর চীনা বন্ধু ও সহকর্মীরা এ প্রস্তাবে কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না। এমন কি আশেপাশের গ্রামের বৃদ্ধ চীনারা পর্যন্ত এ কথা শুনে আনন্দিত হলেন। যুদ্ধের অনেক বিভীষিকা আছে বটে—কিন্তু যুদ্ধ আবার অনেক বাধাকে দূর ক'রে মানবসমাজের গভীর ঐক্য মেনে নিতে আমাদের বাধ্য করে। তা ছাড়া ডাঃ কোট্‌নিস্ তাঁর একনিষ্ঠ সেবার দ্বারা চীনে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে আদর ক'রে বলত "চুঙ্গুও হাইজা" (চীনের সন্তান)। "চীনের সন্তান" এবার "চীনের জামাতা" হ'তে চলেছেন শুনে সবাই বিশেষ আনন্দিত হলেন। গভীর হৃদ্যতা ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। বরের আত্মীয়-স্বজন ও ভারতীয় বন্ধুরা কেউ বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর চীনা বন্ধুরা সে অভাব পূরণ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

এই সময় কোট্‌নিস্ যে কাজ করছিলেন এবং যে ভাবে তাঁর মানসিক বিকাশ ঘটছিল, তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়

ডাঃ বসুর কাছে লেখা তাঁর এই সময়ের চিঠিগুলিতে। শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিপদ্‌-সঙ্কুল ঘোরাপথে যে-সব কম্যুনিস্ট কর্মী ইয়েনানে যেত, তাদের হাতেই কোট্‌নিস্‌ এই চিঠিগুলি পাঠাতেন—কাজেই ডাঃ বসুর কাছে এ সব চিঠি পৌঁছাতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগত। চিঠিগুলি যে ইয়েনান পর্যন্ত পৌঁছাবেই, তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না ব'লে কোট্‌নিস্‌কে অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন চিঠিতে একই খবর বার বার লিখতে হ'ত। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে লেখা একখানা চিঠিতে তিনি ডাঃ বসুকে নিজের কাজের কথা এবং বিয়ের খবর জানিয়েছিলেন ঃ

> "গতবছর আমি কি ক'রেছি, তা খুব সংক্ষেপে লিখছি। গতবছর জানুয়ারী মাসে আমি সরকারী ভাবে অষ্টম পন্থা বাহিনীতে যোগ দিই—সেই সময় আমার ওপর ভার দেওয়া হয় 'আন্তর্জাতিক স্বস্তি হাসপাতালটির' তত্ত্বাবধান করবার। বেথুন মেডিকাল স্কুলে যে 'সো'*-টি ছিল, তার সঙ্গে আর একটি 'সো' জুড়ে দিয়ে এই হাসপাতালটি খোলা হয়েছে। দু'টি 'সো'-তে গড়ে দু'শ রোগী থাকে। হাসপাতালের অধ্যক্ষ হিসেবে আমাকে এর সব রকম কাজকর্মই দেখতে হয়। অস্ত্রোপচারের রোগীদের দেখাশুনোর ওপর এসব কাজ করতে হয় ব'লে

* হাসপাতালের ওআর্ডকে চীনাভাষায় 'সো' বলা হয়।

আমি সব সময়ই বেশ ব্যস্ত থাকি। ডাক্তারী কাজের মধ্যে আমাকে অস্ত্রোপচার করতে হয় এবং ছাত্রদের হাতেকলমে অস্ত্রোপচার শেখাতে হয়। গত বছর আমরা মোট প্রায় চারশ তিরিশটি অস্ত্রোপচার করেছি—তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি অঙ্গচ্ছেদ, বিশটি 'হার্নিয়া,' পঁয়তাল্লিশটি 'লাম্বার' (কটি-প্রদেশ সংক্রান্ত), ও 'প্রী-স্যাক্রাল প্যারাসিমপ্যাথেকটমি' তিনটি 'ইন্‌টেস্‌টিনাল্‌ য়্যানাটমি' এবং কয়েকটি 'জাইনীকো-লজিকাল' অপারেশন ছিল।

"সংক্ষেপে বলতে গেলে এই আমার কাজ। চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে নূতন কিছু শেখবার সুযোগ এখানে মেলে না, কিন্তু অস্ত্রোপ-চারের কৌশলে আমি অনেক উন্নতি করেছি।

"পড়াশুনো সম্বন্ধে বলতে পারি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ইংরাজি বইয়ের অভাবে খুবই অসুবিধে হচ্ছে। ইয়েনান থেকেও কোন বই পাইনি, আর এখানে তো ইংরাজি বই পাওয়াই যায় না। গত বছর প্রথম ছ'মাস এজন্য বেশ অসুবিধে বোধ করেছি। তবে এখন আমি চীনা হরফ অনেকটা শিখে নিয়েছি। "চীন-বিপ্লবের ইতিহাস" প্রভৃতি চীনা বই এবং খবরের কাগজ আমি এখন প্রায় অভিধানের সাহায্য না নিয়েই পড়তে পারি।



উপরে—ডাঃ কোটনিস

নীচে—(বাঁ দিকে) ডাঃ কোটনিসের ছেলে। (ডান দিকে) ডাঃ কোটনিস ডাঃ বেথুনের সমাধিস্তম্ভে মাল্য-অর্পণ করছেন।









উপরে ([illegible] দিকে) [illegible] গুহাগুলি ; (ডান দিকে) শিশু-বাহিনীর একজন তরুণ শিক্ষক—এ গ্রামে গ্রামে যেয়ে নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের লেখাপড়া শেখায়।

নীচে—অষ্টম পন্থা বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য আগত স্বেচ্ছাসেবকগণ।



খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে (বিশেষ ক'রে ইয়েনানের 'চে ফ্যাঙ্ রো বাও'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে) পড়বার মত অনেক কিছু পাওয়া যায়— পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণও পাওয়া যায়। এখন আমার সবচেয়ে বড় অসুবিধা সময়ের অভাব। হাসপাতালের কাজকর্মের দিক দেখতেই অনেকটা সময় লাগে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজনীতি সম্বন্ধে আমার পড়াশুনো খুব সন্তোষজনক হচ্ছে না।

"যাই হোক, গত বছর আমি যা-কিছু ক'রেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল আমার নিজের চরিত্রগত পরিবর্তন। ইয়েনানে আসবার আগে আমার রাজনৈতিক জ্ঞান কত সংকীর্ণ ও অনগ্রসর ছিল, তা তোমার বেশ জানা আছে—আমার মাথা তখন 'বুর্জোয়া' মতবাদে বোঝাই ; জাতীয় আবেগ আমার খুব তীব্র ছিল, অথচ বিপ্লবী কর্মপন্থা সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল ভাসা-ভাসা ধরণের। অষ্টম পন্থা বাহিনীভুক্ত হয়ে এখানে এক বছর থাকবার ফলে, সভাসমিতিতে ও ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় কমরেডদের সমালোচনা শুনে শুনে, আমার চরিত্রে ও

মতবাদে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। তাই ১৯৪১ খৃস্টাব্দকে আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলে আমি মনে করি।

"ভারতবর্ষে ফিরে যাবার কথা আলোচনা করবার আগে আমি তোমাকে একটি খবর দিতে চাই। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নবেম্বর আমি কমরেড্ কুও চিং লানকে বিয়ে করেছি—সেই-যে চশমা-পরা যে মেয়েটি আমাদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে। বিয়ে করবার সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগে আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি। আশ্চর্যের কথা এই, এ বিয়ের ব্যাপারে "প্রাচ্য জাতিমণ্ডলের ফ্যাসি-বিরোধী সংঘ" আমাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত ক'রেছে। ইয়েনানে এই সংঘ গঠন করবার কাজে তুমি তো একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলে, সেখান থেকে তুমি সীমান্ত সরকারের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলে! এই ব্যাপার থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি রাজনীতি ক্ষেত্রে তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছ। আমারও ফিরে যাবার বিশেষ তাড়া ছিল না। তা ছাড়া আমারও মত যে আমাদের দু'জনের একসঙ্গে ফেরা উচিত, এবং ভবিষ্যতে যথাসম্ভব একযোগে কাজ করা উচিত। অবশ্য আমার বিয়ের জন্য

ইয়েনানে বা ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া আটকাবে না, তবু এ কথাটাও ভাল ক'রে ভাবা দরকার······।"

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কোট্‌নিস্ বসুর কাছে একখানা লম্বা চিঠি লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন: "এর মধ্যে আমি ইয়েনান-যাত্রী কমরেড্‌দের হাতে তোমার কাছে খানকয়েক চিঠি পাঠিয়েছি। দুঃখের কথা, কমরেড্‌দের প্রায় সবাইকেই মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে, কারণ তারা শত্রুব্যূহ অতিক্রম করতে পারে নি। কাজেই সম্প্রতি তুমি আমার কোন চিঠি পেয়েছ কি-না তা আমার জানা নেই। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর আমি যা যা করেছি তার একটা বিবরণ সংক্ষেপে লিখছি।"

এই চিঠিতে নিজের কাজকর্মের কথা লিখে, তিনি বলেছেন: "সম্প্রতি স্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাকে অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ে একখানা পাঠ্য বই লিখতে বলেছেন। এতে আমার অনেকটা ক'রে সময় চলে যায়, কারণ শুধু লিখলেই হয় না, লেখাগুলি আবার চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিতে হয়।"

ডাঃ বসু হয়ত তাঁর আগের চিঠি পান নি মনে ক'রে কোটনিস্ এই চিঠিতে আবার তাঁর বিয়ের কথা লিখলেন:

"গতবছর আমার জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের স্কুলের শুশ্রূষা

শিক্ষয়িত্রী কমরেড্ কুও চিং লান্‌কে আমি বিয়ে ক'রেছি। গত বছর নবেম্বর মাসে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমার চিঠি তোমার হাতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের জীবনে একটি নবীন অতিথির আবির্ভাব হবে!

"ইয়েনানে ফিরে যেতে এখন আমি খুবই ইচ্ছুক। দু'টি ব্যাপারের জন্য আমি অপেক্ষা করছি—একটি আমার অস্ত্র-চিকিৎসার বই শেষ করা, আর একটি আমার সন্তানের জন্ম। এ বছরের শেষে কিংবা আগামী বছরের গোড়ার দিকে হয়ত আমি ইয়েনানে রওনা হ'তে পারব। অবশ্য ইয়েনানে পৌঁছাতে কত দিন লাগবে, তা আমার জানা নেই।

"চিয়াঙ্ বুযাঙ্ সম্প্রতি এখানে এসেছে। তার মুখে শুনে খুব সুখী হয়েছি যে তুমি আপাততঃ ভারতবর্ষে ফিরছ না। আশা করি, তুমি আমারজন্য অপেক্ষা করবে। সত্যি অপেক্ষা করবে তো?

"ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, চীনে আমাদের আর বেশী দিন থাকা উচিত হবে না। ভারতের সংগ্রামক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হবে। তোমার কি মনে হয়?"

এই চিঠির মধ্যে কি মর্মন্তুদ আকুতিই না রয়েছে! "আশা

করি, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে। সত্যি অপেক্ষা করবে তো?" বন্ধু তাঁর জন্য অপেক্ষাও করে ছিলেন। কিন্তু কোট্‌নিসের আর ফিরে আসা হয় নি! কোন দিনই তিনি ফিরবেন না!

কোট্‌নিসের মৃত্যুর কাহিনী যেমন মহান্ প্রেরণাপূর্ণ, তেমনই মর্মভেদী—একটি অবিমিশ্র 'ট্রাজেডি'। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি বিয়ে করেন। ১৯৪২এর জুলাই মাসে তাঁর একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ছেলে হয়। সেই বছরই ৯ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

জাপানীদের 'সাও দাঙ্' অভিযানের সময় শরীরের ওপর যে অত্যাচার হয়, তাতেই কোট্‌নিসের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। এক বছরের ওপর ধ'রে মাঝে মাঝে তাঁর মৃগী রোগ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি এত অনুভূতিপ্রবণ ও সাহসী ছিলেন যে কাউকেই তিনি সে কথা জানতে দেন নি, নিজের স্ত্রীকেও না। নিজে ডাক্তার ব'লে মৃগীর আক্রমণ হবার আভাস তিনি আগেই পেতেন; তখন তিনি চুপি চুপি একা পাহাড়ের দিকে চলে যেতেন—আক্রমণ শেষ হ'লে তবে তিনি ফিরতেন, যাতে তাঁর জন্য কেউ উদ্বেগ বোধ না করে। বিশ্রাম এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অবিরাম অতিরিক্ত কাজের চাপ, উপযুক্ত ওষুধপত্রের অভাব—এই সব নানা কারণে তাঁর তরুণ দেহের রোগ-প্রতিষেধ শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই এই ব্যাধিই তাঁর

কাল হয়ে দাঁড়াল।

উত্তর চীনের এক অখ্যাত গ্রামে একটি মাটির কুটিরে কোট্‌নিসের মৃত্যু হয়। জননী ও জন্মভূমির কাছে ফিরে যাবার আকাঙ্খা, চীনের মত ভারতবর্ষের সেবা করবার আকাঙ্খা—এ সব অপূর্ণ রেখেই তাঁকে এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হয়।

চিরনিদ্রার অন্ধতিমিরজাল যখন তাঁর চেতনা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল, তখন তিনি তাকালেন তাঁর প্রিয়া ও কর্মসহচরীর মুখপানে, তাকিয়ে দেখলেন তার কোলে ছ'মাসের শিশুটিকে—সে যেন চীন-ভারতের মিলনের জীবন্ত প্রতীক! হাসিমুখে তিনি তাদের বিদায় জানালেন। তারপর, চোখ দু'টি ধীরে ধীরে মুদে এল—চিরদিনের মত। কিন্তু মুখের হাসি তাঁর মিলিয়ে গেল না। জীবনে ও মরণে দ্বারকানাথ যে ছিলেন চিরনির্ভীক!

কুটিরের বাইরে সমবেত চীনা সামরিক কর্মচারী ও সৈন্যরা গভীর বিষাদে নীরবে মাথা নোয়াল। তারা তাদের সহকর্মীর শোকে বিহ্বল।

সুদূর ভারতবর্ষে তাড়িতবার্তা তাঁর মায়ের কাছে এ খবর নিয়ে গেল। জন্মদাত্রী যিনি, তাঁকেই বহন করতে হ'ল মৃত্যুর নিদারুণ বেদনা।

তাঁর শোকের অংশ গ্রহণ করল একটি সমগ্র জাতি—একটি কেন, দু'টি জাতি। সারা পৃথিবীতে যারা স্বাধীনতা ও

মানবসেবায় আস্থাশীল, তারা সবাই গ্রহণ করল তাঁর শোকের অংশ। দ্বারকানাথ কোট্‌নিস্—যিনি ফিরে আসেন নি—তাঁর স্মৃতি বেঁচে থাকবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের অন্তরে।

ভারতবর্ষে প্রেরিত একটি বাণীতে মাদাম সান্ ইয়াৎ সেন বলেছেন ঃ—

> "ডাক্তার কোট্‌নিসের স্মৃতি শুধু আমাদের দুই মহাজাতির নয়। স্বাধীনতা ও মানবের অগ্রগতির জন্য যাঁরা অনমনীয় ভাবে সংগ্রাম করেছেন, সেই মহান্ যোদ্ধাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে তাঁর স্মৃতি। বর্তমানের চেয়েও ভবিষ্যৎকালে তিনি বেশী সম্মান পাবেন, কারণ ভবিষ্যতের জন্যই তিনি সংগ্রাম করেছেন, তারই জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।"

—সমাপ্ত—